KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নম্বর লেন, যাদবপুর, কল-৩২
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রবেন্দু দাশগুপ্ত
Title : অলিন্দ (ALINDA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : (গ্রীষ্ম সংকলন) (শরৎ সংকলন) (গ্রীষ্ম সংকলন) (শারদ সংকলন)	Year of Publication : ১৩৯১ ১৩৯১ ১৩৯২ ১৩৯৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রবেন্দু দাশগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

গ্রীষ্ম সংকলন
১৩৯২

অনিন্দ

সম্পাদক
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

অলিন্দ

যাণ্মাসিক সাহিত্য সংকলন

গ্রীষ্ম ১৩৯২

শঙ্খ ঘোষ, লোকনাথ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, শান্তিকুমার ঘোষ, দীপংকর দাশগুপ্ত, সুজিত সরকার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ভাস্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণা বসু, মৃণাল দত্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ, অভী সেনগুপ্ত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী, সুব্রত রুদ্র, শামসের আনোয়ার, রাখাল বিশ্বাস, দেবারতি মিত্র, রণজিৎ দাশ, রথীন্দ্র মজুমদার, রাণা চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী, কাশীনাথ বসু, অমিতাভ দাস, নির্মল হালদার, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শুকতারা রায়, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রত চক্রবর্তী, অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু বসু, সুতপা সেনগুপ্ত, মানস সরকার, খোকন বসু, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সোফিওর রহমান, কৃত্তিবাস রায়, শান্ত রায়, মঞ্জুভাষ মিত্র, শ্যামলকান্তি মজুমদার, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীন্দ্র গুপ্ত, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অরণি বসু, উর্মিলা চক্রবর্তী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

সম্পাদক ও প্রকাশক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত

পৃষ্ঠপোষক : ডক্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রণ : ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস। কলকাতা-৯

দাম : চার টাকা

"অলিন্দ" আপাতত বন্ধ রইলো।

□

যোগাযোগের ঠিকানা :
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
৩ নর্থ রোড, যাদবপুর,
কলকাতা-৭০০০৩২

টেলিফোন—৭২-২০২৫

ফলক

বিলাপের ভার নিয়ে জেগে উঠছে এই সকালবেলা
কবরখানার ওপর

কেউ কেউ ফেলে রেখে গেছে ক্রিসেনথিমাম
তাদের পায়ের চিহ্নে ছেঁড়া পালক

ছেড়ে দিতে দিতে অনেকদূরে চলে গেছে তারা
যেখানে কোনো ধুনি নেই, তাই ছাইও নেই

ভয় পেতে পেতে তারা মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়
যেখানে ডানা নেই। তাই রক্তও নেই

আর, এই তো এখানে ভাঙা সিমেন্টের ওপর নেমে আসবে শুকনো ঠোঁট
তার আগে

কাল রাত্রিবেলার বিশ্বাসের কথা ভাবি
ভাবি এই-বা কী কম, এই-যে বর্শার ফলক নিয়ে বেঁচে থাকা।

স্তবক

অস্ফুট স্তবক, তুমি জেগে আছো মধ্যরাত্রিযামে
স্বপ্নের খোলস ভেঙে তোমার অস্থির দেখা পাওয়া
ভ্রষ্ট হয়ে গেলে দিন ভ্রষ্ট হয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলা
বিন্দু বিন্দু পরিত্রাণে ভ'রে যায় আত্মবলিদান।

অরুণোদয়

উঠে যাবার আগে, বন্ধু, ফেলে দিয়ে যাবে কাগজের এই ছিন্ন কুচিগুলি।

কিছু মেঘ আলগা-আলগা, কিছু কথা, কিছু স্মৃতি। কিছু বন এধার-ওধার, কিছু মন এপার-ওপার, কিছু অর্থ কিছু অর্থহীনতা।

ফেলে দিয়ে যাবে।

বেগ আছে এই পৃথিবীর হাওয়ায়, সমুদ্রে—শক্তি আছে শূন্যের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। বাঁশি বাজে। চলার ইতিহাসের বাঁধুনি সে অটুট ক'রে রাখে। তাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, শোনা যায় না।

যা বুঝেছ, বন্ধু, তা ফেলে দিয়ে যাবে।. কাগজের ছিন্ন কুচি।

প্রিয়ার স্মৃতি পাশে ব'সে আছে, যখন লিখলাম এ-কথা—তার চোখের কিছু অংশ এখনো আমার মনের দর্শনে। কপালে যা পরত, যা পরলেই হত আকাশে অরুণোদয়, সেই অনেকগুলোর একটা টিপ তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে—এখন তা দুর্গাপ্রতিমার চোখের মনি হ'য়ে লটকে আছে আয়নার একটি কোণে, আমারই চোখের সামনে।

প্রতিমা গেছে বিসর্জনে।

হাওয়া স্তব, হাওয়া বয়, যা চালায় তার শক্তি চলে।

কাগজের ছিন্ন কুচিগুলি ফেলে দেবে। ফেলে দেবে।

বলতে-বলতে

১

তুমি কি বিষয়, নাকি ব্যক্তি, তুমি—তুমি কি শুধুই
নারী ?
তুমি শুধু পুরুষের জুবিলি-উৎসবে
অরণি হবারই
অনুমতি পেয়েছ, তাছাড়া
অন্যত্র মেলেনি আর কোনো অধিকার।
সন্ধ্যাবেলা
তুলসীতলায় শুধু দীপ জালাবার
সনদ পেয়েছ অলিখিত

আমি এই কথা বলি, বলতে-বলতে
আমি কোনো ভুল করিনি তো ?

২

পথের মধ্যে যা দেখেছি দারুণ দুর্ঘটনা
ত্রিতাপদৃশ্য
এসব তোমায় বলতে-বলতে হঠাৎ দিব্য আনন্দ-আভায়
জ্বলতে থাকি,
তোমার কাছে বলতে গেলেই সবকিছু বিকচ পদ্ম হয়ে
পূর্ণতা পায়

তোমায় রেখে কিছুক্ষণের জন্যে আমি তবে
স্রষ্টা নারীর বারান্দায় যাবো

৩

আমার এখন সেই বয়স
যখন পাউল সেলানের মৃত্যু হয়েছিল

তাহলে তাঁর মতো
গড়ব নাকি গূঢ়গহন বীজমন্ত্র ?

এখন আমার হুবহু সেই বয়েস
যখন আমার অধ্যাপক শশীবাবুর মৃত্যু হয়েছিল

তবে কি তাঁর মতো
বলতে পারব দুরূহ সব কথা
সহজ সরল করে ?

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

আকাশ-পরিচয়

এই যে নির্যাস আমি ভাষা—
ধীর বন্দুকের···

তা-থেকে, একজঙ্গল চলেছে স্রোতের মুখে-পড়া
মিছিল, কাপড়কাচা।
চ'লে গেলো—
ঝ'রে-পড়া পাতা ও ইঁটের রঙ
লাইব্রেরিভবন ঘুরে, পশ্চিমে, টিউবওয়েল-ভাঙা—
চিরপরিচিত—এক শেষে।

শেষের, বন্দুকলব্ধ শ্লথ উচ্চারণ ভুলে, শিখেছি আকাশ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

কঠিন অনুভব

চারধারে তার উপঢৌকন, কিন্তু আছে স্থির
দুহাত মুঠিবদ্ধ, কিন্তু ভিতরে অস্থির
কেউ তাকে দ্যাখেনি হতে, উচিত ভেবে সব
ফিরিয়ে দিল, তার ছিলো এক কঠিন অনুভব।

তন্ময়তার রূপ

দুচার রেখায় জাগিয়ে দিল তন্ময়তার রূপ।
কী রূপবান, কিন্তু তাকে অসহ্য লাগছে না,
মৃত্যু নামে ছিলো একটি অপার অন্ধকূপ,
মৃত হবার পরেও কোনো আদরে জাগছে না—

দুচার রেখায় জাগিয়ে দিল তন্ময়তার রূপ।

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

টান

গান-বোনা দিনের শেষে মাটি মাখা হাতে তুমিও ফিরছো ঘরে।

কাঁখে শিশু, খোলা স্তন, চুড়িতে লেগেছে মাটি
মাটির ওপর দিয়ে তুমিও ফিরছো ঘরে।

ঘরে পড়ে আছে মন
মনে লেগে আছে রং
চুলে বসে আছে প্রজাপতি
কথায় লেগেছে রস

গান-বোনা দিনের শেষে মাটিমাখা হাতে তুমিও ফিরেছো।

মানস রায়চৌধুরী

দুখ-জাগানিয়া

আংটি নয়, চিঠি নয় অথবা ছবির উল্টোপিঠে
রেখে যাওনি কোন প্রকারের স্মরণিক
আমাদের সম্পর্ক এখন শুধু স্মৃতির দয়ায় বেঁচে আছে।
মনে পড়ে খুব মনে পড়ে
শীতের কুয়াশা ছিঁড়ে মুখ
দেখা গিয়েছিল সেই ধলভূমগড়ে, কোন ভোরে
সে টুকুই সুখ। তুমি ঝুড়ি ভরে দাওনি হেমন্ত
পেয়েছি মুহূর্ত একা পথে হাঁটতে হাঁটতে, তুমি
পিছনে ডাক নি।

বোধ হয় ভালো হয়েছিল। তুমি সেই রাত্রে দাওনি বিছানা
শীতার্ত ত্বকের নীচে নিঃসঙ্গতা জেগেছিল,
সারারাত দীর্ঘতম রাত।
বয়স বেড়েছে, কেউ যদি এই সম্পর্কের গূঢ়তা যাচাই
করতে চায়
তাহলে আকাশ হাসবে ঠোঁট চেপে, তার নীচে যেন
অনেক পোষাকে ঢাকা নগ্নতায় আমাদের ভালবাসা পাবে
অথচ কিছুই রেখে যাওনি স্মৃতির দয়া দুখ-জাগানিয়া।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রদর্শনীর শেষ দিন

শেষদিনে প্রদর্শনী ভালো লাগল।
শাল ও সোয়েটার মোড়া উৎসাহী মানুষ, বেশ ভিড়
ক্রীমমাখা মেয়েদের মুখ, তার মধ্যে বিকাশের 'জুডিথ' ছবিটি
ব্রাউন, বিমর্ষ।
ও কি অন্ধ? ও কি ভিক্ষু? ওকে যেন অন্য দুটি
প্রকট ছবির পাশে উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কই ধর্মনারায়ণ
শ্যামল ও অমিতাভ?
গণেশবাবুর ছবি, এত প্রিয়, এবারে খানিকটা যেন ম্লান।
দীপ বলেছিল, তাঁর বর্ণ ব্যবহারে কিছু গোপনতা থাকে।
ওদিকে ক্যানভাস বড়ো শাদা, নগ্ন, রাগী;
'অন্য কোনোখানে' ছবিটি কিনেছে কেউ:
আরোহীবিহীন রিক্‌শা—দেখতে শান্ত নির্জন অথচ
সামনের চাকায় তার বাঁকা জিদ সুন্দর, সংহত।
তিনখানি মুখোশ ঐ যে, অভিনব। শিল্পীরা কখনো
স্মিত পরিহাসপ্রিয়, দেখলে আনন্দ হয়,
তারা পারে
বাঁশ কাঠ মৃৎপাত্র উৎকীর্ণ করে প্রাণ দিতে; কবিরা পারে না।

সকলের দৃষ্টি কাড়ছে ওই মধ্যবর্তী ব্রোঞ্জ
তুপাকার কালো, নাম শীতের সকাল। অনেকক্ষণ
ঘুরে-ঘুরে ভাস্করের মতলব বোঝার চেষ্টা করি।
ক্রমে আবিষ্কৃত হয় তুচ্ছ মাথা বালিশে ঠেকানো—
সূত্র ধরে উলটুল, বিছানা, লেপ
অনিচ্ছুক দুটি শীর্ণ হাত কোনোক্রমে
অতিশয় কিছু ধরে আছে।
কালো ব্রোঞ্জ ক্রমশ চোখের সামনে শুভ্র হোল,
পবিত্র আরাম স্পর্শ করি ভাঁজে-ভাঁজে,

দেখতে পাই, খোলা
পতাকা না, সংবাদপত্রের গায়ে রোদ্দুর পড়েছে।

রত্নেশ্বর হাজরা

এই উষরতার বয়স

পৃথিবীর চেয়ে বড়ো—বয়সে অনেক বড়ো এক
উষরতা
এখানে রয়েছে……
এই উষরতা কতো বয়স্ক হয়েছে কেউ
এখনো জানে না—
হয়ত কিছুটা জানে দারুণ শব্দায়মান মেঘ
কিছু জানে
বহু আগে হিমযুগ পার হয়ে চলে আসা
নিরক্ষরেখার নিচে জল—।
অথচ এদের কেউ-ই হিসেব রাখেনি কারো বয়সের—কেউ
হিসেবও জানে না……
তাই আমরাই বলি আমাদেরই বলতে হয় এই
পৃথিবীর বয়স এতো এরকম হতে পারে ওই
ভূখণ্ডের বয়স—আর
শিলা ও প্রাণীর বয়স
ঐ নক্ষত্রের বয়স
হয়ত শব্দেরও বয়স আর
এই উষরতা ! হয়ত তারও
বয়সের হিসেব একটা—আমাদেরই কেউ
বলে দেবে—

আমি যে-দিকে তাকাই

আমি যে-দিকে তাকাই
শুধু পাহাড়ের নিষেধ
বলে, তাখো চেয়ে ভিতরের দিকে
পাথরে পা রেখে পা রেখে
চলো যাই চূড়ার উপরে
শোনো কান পেতে
হাওয়ায়-হাওয়ায়
শান্তির প্রথম বাণী—ধর্মোপদেশ
থাকুক স্বর্ণ-ভাণ্ডার বনের অন্তরে
পরিত্যক্ত কবেকার মল্লভূমি—
ভীম জরাসন্ধ ছায়ামাত্র আজ

করুণায় আর্দ্রপ্রাণ বাড়িয়ে আছেন ঐ
পদ্মপাণি তাঁর

দিব্য মুহূর্ত

এই কি দিব্য মুহূর্ত
অন্তিম বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে সে
জ্যোৎস্না মিশে আছে জলে
নীচে নৌকায় দুলছে আরোহী

এখনো অস্ফুট ডাকেনি নাম ধ'রে
শুধু অনুকূল বাতাসে দেহ-সৌরভ
দূরত্ব সব পেরিয়ে দৃষ্টির চুম্বন

প্রথম প্রেমিক, কেন শোক করা
মিলিয়ে যাবে না সে

ভালোবাসবে তুমি চিরদিন
আর রইবে সে সুন্দর

যদিও ফুরোয় আয়ু আমাদের—
হয় যৌবন নিঃশেষ

দীপংকর দাশগুপ্ত

অপ্রবাসী

শাকান্নই তোমার সম্বল
থাকো শুধু থাকো চোখ ভ'রে দেখো
নিজের কুটির লাউমাচা স্থলপদ্ম স্বর্ণচাঁপা
নিকোনো উঠোন পাশের দিঘিতে ভাসে
কুমুদকহ্লার শারদ সোনালি রোদে
দেখো শুধু দেখো

বাতাসে দূরের ঘ্রাণ হাতছানি দিয়ে ডাকে
সমুদ্র পর্বত কেন যাবে অশথ গাছের নিচে
কিশোরকিশোরী চিরন্তন তোমার কৈশোর
কেন যাবে থাকো শুধু থাকো চেয়ে দেখো

সেই আমি প্রতিদিন সন্ধ্যারাত্রে
শাকান্নই আমার সম্বল ॥

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তীর 'কবি অমিয় চক্রবর্তী' রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান এই কবির ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের ওপর মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন এবং এই আলোচনাগুলি 'কালের পুতুল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধদেবের আলোচনা আরো অনেকের মতো শ্রীমতী চক্রবর্তীকেও প্রাথমিক স্তরে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার ওপর একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে, যদিও বুদ্ধদেবকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেননি। কিন্তু সেকথায় পরে আসছি। অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার কেন্দ্র যদিও অমিয় চক্রবর্তীর বিশেষ একটি কবিতা, তবু ঐ কবিতাটির প্রসঙ্গে তিনি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোকপাত করেছেন। অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্তের 'স্থির বিষয়ের দিকে' গ্রন্থে 'অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যমীমাংসা' নামে একটি প্রবন্ধ আছে, এছাড়া 'বাসা-বদল' নামে অমিয় চক্রবর্তীর একটি কবিতার ওপর পৃথক একটি আলোচনা আছে। এছাড়াও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার ওপর কেউ কেউ দু-একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু শ্রীমতী চক্রবর্তীর গ্রন্থটিই প্রথম নজির যেখানে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার ওপর বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় দার্শনিক প্রবণতা, আন্তর্জাতিক চেতনা, রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার তুলনামূলক আলোচনা, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার শব্দ, ছন্দ, রীতি, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে লেখিকার একটি সাক্ষাৎকার, অমিয় চক্রবর্তীর জীবন, বংশলতিকা, রচনাপঞ্জি—সমস্তই আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এই কাজ এবং শ্রীমতী চক্রবর্তী নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটি সম্পূর্ণ করেছেন। এর ফলে বর্ত্তমানে বাংলাসাহিত্যে যে সীমিতসংখ্যক কাব্যসমালোচক আছেন, তাঁর মধ্যে খুব সহজেই নিজের জায়গাটি করে নিয়েছেন।

শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তীর ভাবনা-চিন্তা অত্যন্ত পরিস্কার। কোথাও তাঁকে পক্ষপাত দুষ্ট মনে হয়নি। ধীরে ধীরে যুক্তির সাহায্যে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সমালোচকের থাকা প্রয়োজন,

তিনি পূর্ণমাত্রায় সেই গুণের অধিকারিণী। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

একথা ঠিক যে বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব যদি জীবিত থাকতেন ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের কাব্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করতেন, তবে নিঃসংশয়ে অমিয় চক্রবর্তীই সেই আলোচনায় প্রাধান্য পেতেন। রবীন্দ্রকাব্যে যে শুভচেতনা আবু সয়ীদ আইয়ুবকে করে তুলেছিল রবীন্দ্রপ্রেমিক, উত্তররৈবিক যুগে সেই শুভবোধ একমাত্র অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। যে মিলন-মন্ত্রের বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যে, তা অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যেও ধ্বনিত : 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন' কিংবা 'মেলাবার দৈব, এই মাটি জুড়ে আমার বুকে'। তবে উভয় কবির মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট, আর সেই কারণেই অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক কবি। ঠিক কোথায় অমিয় চক্রবর্তী রাবীন্দ্রিক জগত থেকে সরে গেছেন, তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে লেখিকা তুলে ধরেছেন। যেমন, গতিচেতনা সত্ত্বেও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় রবীন্দ্রকবিতার মতো কোনো উত্তরণের উপলব্ধি নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'নদী' প্রতীকী তাৎপর্যে মূল্যবান। অমিয় চক্রবর্তী 'সমুদ্র' নিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং শ্রীমতী চক্রবর্তীর ভাষায় 'সমুদ্র—যা নিরন্তর আন্দোলিত হয়, কিন্তু কোথাও যায় না।' রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার আরো একটি বড়ো পার্থক্য অমিয় চক্রবর্তীর বিজ্ঞানদৃষ্টি। শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে সরাসরি জেগে ওঠে অতীন্দ্রিয় অনুভব, অমিয় চক্রবর্তী বস্তু ও চেতনার মধ্যে ঐক্য নির্ণয় করে বিশ্ববোধের ব্যাপকতায় প্রবেশ করেছেন।' আন্তর্জাতিক চেতনার দিক থেকেও দুই কবির পার্থক্য খুব স্পষ্ট। 'রবীন্দ্রনাথের রচনায় আন্তর্জাতিক সংকটবোধ তীব্রতর এবং যন্ত্রণাময়; অমিয় চক্রবর্তীর মনোভাব আন্তর্জাতিক প্রীতিবোধে স্থিত।' তুলনামূলক এই আলোচনায় আরো একটি অসাধারণ অ্যানটিথেটিক্যাল বাক্য : 'রবীন্দ্রনাথ নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টিকে দেখেছেন, অমিয় চক্রবর্তী নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিশ্বাস গড়ে নিয়েছেন।'

শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই নয়, সমকালীন কবিদের সঙ্গেও অমিয় চক্রবর্তীর পার্থক্য কোথায়, লেখিকা তা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন : 'জীবনানন্দের মতো যন্ত্রণার গভীর ও জটিল চিহ্ন তার কবিতায় নেই, নেই বুদ্ধদেবের মতো সৌন্দর্যমুগ্ধ, আবেগকম্পিত কাব্যোৎসার। সুধীন্দ্রীয় হতাশাবোধ বা তার্কিক-

সুলভ রীতিও তাঁর কবিতায় দেখা যায় না। পৃথিবী, ঈশ্বর, মানুষের গহন-চেতনার স্বরূপ, মৃত্যু ও বিজ্ঞান-এই পাঁচটি মূল ধারায় তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির স্রোত কবিতা হয়ে প্রবাহিত হয়েছে।'

আলোচনার শুরুতে আমি বলেছি, বুদ্ধদেবের মতকে লেখিকা পুরোপুরি সমর্থন করেননি। সে প্রসঙ্গে এবার আসছি। অমিয় চক্রবর্তীর তত্ত্বধর্মী কবিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ ক'রে বুদ্ধদেব বলেছেন, 'সত্যসুন্দরের তত্ত্বকথার ক্ষেত্রে তিনি যেন কুয়াশায় দিশেহারা হয়ে পড়েন।' কিন্তু লেখিকা রবীন্দ্রনাথের 'আমি' 'মরণ' 'বলাকা' ও 'পৃথিবী' কবিতার উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে দার্শনিক চিন্তাকে ধারণ করলেও এ কবিতাগুলি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্তর্ভুক্ত' বুদ্ধদেব বলেছেন, 'অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সবচেয়ে কম' শ্রীমতী চক্রবর্তী স্বীকার করেছেন যে ভালোবাসার শারীরিক দিকটি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অনুপস্থিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ করেছেন যে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় চোখ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপক ব্যবহার। তাই তাঁর বক্তব্য : 'রক্তমাংসের আক্রমণটাই শুধু দেহ তো নয়। চোখে দেখি, কানে শুনি, চামড়ায় স্পর্শ পাই—এও তো দেহেরই ব্যবহার।' তৃতীয়ত, কবিতায় নতুন শব্দনির্মাণের দিকে অমিয় চক্রবর্তীর প্রবনতা-ছিল, যেমন, 'তুমিহীন জীবনতা', 'যৌবনী জনতা'। বুদ্ধদেব মনে করেন, এ ধরণের প্রয়োগ ব্যাকরণদুষ্ট; কিন্তু লেখিকা তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন 'জীবন' বলতে যা বোঝায় জীবনতা বলতে ঠিক তাই বোঝায় না', অবশ্য এ ব্যাপারটাতে আমিও লেখিকাকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারি না।

অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে লেখিকার সাক্ষাৎকারটি মূল্যবান। 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন'-এর রচয়িতা আজ জীবনের অস্তিম-পর্বে এসে বলেছেন, 'ব্যক্তিরূপী ঐশিক শক্তি সম্পর্কে আমার ধারণার ক্রমশ: কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আজ আমি মনে করি কোনো চরম ব্যক্তির সাধ্য নেই সব কিছুকে মেলাবার। জগৎ-সংসার অসীম রহস্যময় নিয়মে চলে। এখন আমি শুধু সেই রহস্য উদ্ঘাটক অনুশীলন সাধ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের যাথার্থ্যে বিশ্বাস রাখি।' আর একটি ব্যাপার অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। যে সমস্ত কবিদের দ্বারা অমিয় চক্রবর্তী প্রভাবিত হয়েছেন বলে স্বীকার করছেন, তার মধ্যে হপ্‌কিন্সের উল্লেখ নেই।

পরিশেষে বলি, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'কবি জীবনানন্দ দাশ' যেমন জীবনানন্দকে বোঝাবার জন্যে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ, তেমনই শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তীর গ্রন্থটিও অমিয় চক্রবর্তীকে বোঝবার জন্যে একান্ত অপরিহার্য।

কবি অমিয় চক্রবর্তী। সুমিতা চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯

হাসানের জন্যে

আমি অনেক কবিতা লিখলাম, হাসান, তুমি তার কিছুই পড়ো নি,
অনেক না হোলেও কয়েকটা ছবি করলাম, তুমি তার
কিছুই দেখো নি। হাসান,
তুমি গাড়ি চালাও নিঃশব্দে, তোমার প্রিয় রাস্তা রেড রোড।
আমি যত তোমাকে আস্তে চালাতে বলি, তুমি রেগে ওঠো,
ওভারটেক করতে বারণ করলে ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকাও।
সেবার যখন পরপর সাতদিন অসুস্থ ব'লে এলে না
আমি তোমাকে দেখতে গিয়ে দেখলাম
তুমি তাস খেলছো ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে নিয়ে।
পরে জেনেছিলাম, আসলে তোমার কিছুই হয়নি,
সাতদিন শুধু তাস খেলেছিলে আর ঘুমিয়েছিলে।
হাসান, তুমি কোনদিন জানতে চাওনি আমার বাবার নাম কি
আমরা ক' ভাই,
তুমি কোনদিন জানতে চাওনি আমি কি করি, বা
জেনেও জিজ্ঞাসা করনি কোনকিছু,
তুমি কোনদিন জানতে চাওনি আমার ছবি বা পাঁচটা কবিতার বই সম্পর্কে।
এখন বৃষ্টি পড়ছে, তুমি গাড়ি চালাচ্ছো, হাসান, পাগলের মতো।

আয়নার ভেতর দিয়ে তোমাকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে,
আমাকে দেখাচ্ছে একটা ভয় পাওয়া দানোর মতো।

জানুয়ারী, ১৯৮৩

আজ বসন্তের হাওয়া ভেসে আসে শীতের গভীর দেশ থেকে !
আবার ছাইয়ের থেকে জেগে উঠে জুড়ে নিই ডানা
মানুষের কাছে গিয়ে লিখে রাখি ঠিকানা, বাড়ির ;
নিশ্চয় দেখা হবে—সটান হাজিরও হতে পারি—
আজ শুধু অস্পষ্ট সুদূর এক মুখ মনে পড়ে
জীবন, বসন্তবৌরী, বিরল হাওয়ার দিনে মনে হতে থাকে ফের আজ।
১৬-১-'৮৩

আমাদের কথা

স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে সরু পথ দিয়ে আমরা এগোই।
মোহ আর মোহহীনতার মধ্যে আমাদের বাড়ি।
দু'পয়সার কাস্টমার আমরা সব, কিছু কেরামতি
দেখিয়ে উধাও হই একদিন ;

তারপর পড়ে থাকে বৃষ্টির ভাষা আর কাঁটাতার, মুদ্রিত পৃথিবী।
২৫-৭-'৮৩

কৃষ্ণা বসু

অফুরাণ নদীটির কাছে

অফুরাণ নদীটির কাছে ঠিক যাবার কথাই ছিল
কথা ছিল কিন্তু যাওয়া হয়নি কোনোদিন
সেই নদী বয়ে গেছে প্রান্তরের ধার দিয়ে
জীবনের পাশ দিয়ে বিপুল মায়ায়
খর দ্বিপ্রহরে স্বপ্নের ভিতরে সে বিলিয়েছে
শুশ্রূষার সান্ত্বনার বিশ্বাসের জল

প্রাসাদ গড়েছি শুকনো বালির ভিতর
তীব্র বালি জানে নাকো জলের প্রশ্রয়
তবু জল বয়ে যায় নদীটির নাম নিয়ে
জীবনের পাশ দিয়ে বিপুল মায়ায়।

সমুদ্র শান্ত হলে

তিনদিন পর ফিরে এল আমার পুরুষ,
ঝড়ের সমুদ্রে গিয়েছে সে তিন দিন আগে,
বাতাস দুরন্ত খুব, বঙ্গোপসাগর ফুলে উঠেছিল,
বেতারেতে বার বার বলেছিল সাবধানের কথা।

বাছারা কেঁদেছে খুব আর রান্না হয়নি উনোন জ্বলেনি,
শুধু মুড়ি খেয়ে কেটে গেছে কোনো মতে,
সারাক্ষণ ভয় ছিল জেগে,
আর দু চোখের পাতা ছিল কঠিন পাথর,
তিনদিন দুই রাত্রি পরে দেখা গেল রোদ্দুরের আভা,
দূর আকাশের দিকে ভেসে উঠল
পর পর তিনটি বিন্দুর মত চেনা নৌকাগুলি—
এখন দুপুর বেলা
উনোনে ফুটছে ভাত

মাছের গায়েতে নুন
ছেলেরা খেলছে নৌকোর উপর
খুব শান্ত হয়ে আছে সমুদ্রের তীর
খুব রোদ আছে
দূরে অন্ধ ভিখারী গাইছে গান,
কাজ করি, ঘুরি ফিরি,
ঘরে ফেরা পুরুষের গায়ের গন্ধটি ভাসে
ঘরের বাতাসে···,

আজ রাতে গোল চাঁদ অধিকার করে নেবে
বাউ বন নোনা জল জেলেদের পাড়া!

মৃণাল দত্ত

অলৌকিক আলো

অলৌকিক আলো নামে বিকেলের দিকে। পউষের মাঠে
স্থির দিগন্তরেখায়
যে কৃষক হেঁটে যায় আছাড়ে উড়িয়ে ধুলো সে-কী ভাবে, সে-কী বোঝে
কেন এই আলো, এর তাৎপর্য কতোটা?

ছায়া পড়ে, ধান্যবলুণ্ঠিত মাঠে ছায়া পড়ে শরীরের ক্লেদ ক্লান্তি
অবসাদজনিত রৌদ্রের;
মানুষের শ্রমদীর্ঘ দীর্ঘ ও বিকৃত ছায়া পড়ে থাকে আলের উপরে
হেমন্তশেষের রুক্ষ ধূসর পৃথিবী জুড়ে গোধূলিসন্ধির
আলো নামে দিগন্তরেখায়।

যে কৃষক হেঁটে যায় সে শুধু তাকিয়ে থাকে, অলৌকিক আলো তার
নিগূঢ় রহস্য তাকে কার্যত টানে না।

কালীকৃষ্ণ গুহ

শিল্প

তোমার প্রশ্নের থেকে দূরে গিয়ে যা কিছু দেখেছি সব
মেঘময় ছিলো।
ছিলো ভেজা—ঘুরে ঘুরে অবাধ বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া।
কবে অন্ধকার হবে, মেঘময় হবে মাঠ, বাঁশবন, সমস্ত কৈশোর খেলাধুলো
তারই জন্য অনেক অপেক্ষা ছিলো।

ক্যামেরা প্রস্তুত ছিলো— শুধু চাই অমোঘ শিল্পের বাস্তবতা।

অবসর

অবসর নিয়ে তুমি প্রকৃত লেকের দিকে গেলে।
আগে যা দেখো নি, সেইসব, বেঞ্চ, বিষ্ঠা, প্রত্ন-নির্জনতা
দেখে এক বিহ্বলতা পেয়ে গিয়েছিলে।
বিহ্বলতার পাশে সত্যানুসন্ধান, শুষ্ক হাসি, তাত্ত্বিক হিদুত্ব, সব পেয়ে গেলে
লেকের জলের কাছে গিয়ে।
তারপর কেটে গেছে অবিবাহিতের আরো দশটি বছর।

কারা আসে ?
ভাই, গত দশকের বন্ধু, বাঁশিঅলা বুড়ো, নিরন্ন প্রেমিক, শুদ্ধতম মেয়ে···

না, আজ সমস্তকিছু ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে।

অভী সেনগুপ্ত

আবহমান নিয়তির মধ্যে

'ও-র জন্মও একটি দুর্ঘটনা থেকে'—একরাশ চুলের মতনই মহিলা তার একটি নিজস্ব সম্পদকে বন্ধন খুলে এলিয়ে দিলেন। চেনা আর নাম না-জানা মিশ্র রঙের কার্পেটের গণ্ডী ছুঁয়ে চারদেয়াল, অপেক্ষারত আসবাব—ছিল এইসব, উপবিষ্ট আমি, আরও কিছু। পেলমেটে—পেলমেটে যেখানে নেমে গ্যাছে গাঢ় ও হাল্কা সবুজে মিশে থাকা পর্দার বনভূমি। আর কোথাও উপত্যকার ইতস্তত শাওলার নীচে ডুবে-থাকা জলাশয়ের, তার সমাহিত গভীরের চঞ্চল প্রাণীরা আকাশ-দেখার মনস্কতায় ওপরের স্তর অল্প সরিয়ে উঁকি দিচ্ছিল ক্রমান্বয়ে। এভাবেই তবে বালির শয্যায় উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা নৌকা সেই মুহূর্তে তার স্মৃতির রক্তমাংসে সরাসরি ঢুকেছিলো না কি ? দূর আকাশ থেকে পাখির ডানার মতন বিস্তর বাতাস সরিয়ে আসতে-আসতে জায়গাটিতে নেমে এলো আমার কৈশোরে শোনা উৎপলা সেনের গান—বেদনার মতো কি আছে মধুর আর। এই সেই মুহূর্ত যখন কাঙ্খিত আড়াল চ'লে আসে, যখন লজ্জা আর নানান সুন্দরে তোড়াবদ্ধ সদ্যযুবতীর স্তনে ঈষৎ কেঁপে-ওঠা হাত কিম্বা মুখ রাখে প্রথম পুরুষ। আর ঘরের এক কোণে, চেয়ারের গায়ে হেলান-দিয়ে কার্পেটে-বসা ঐ পূর্ণযুবতী ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন শীতে সেজে-ওঠা শব্দগুলির গোপনীয়তা, এক মোহভঙ্গের কাব্য। মনে হলো এই মহাদেশে আবহাওয়ার রসায়নে বাতাস বুঝি শূন্য হয়ে এলো কোনও মাঝসমুদ্রে, যত জল গভীরতার দিকে ছুটে যেতে চেয়েছিলো পাতালাভিমুখী আর প্রান্তরের দিকে বালুকাবেলায় উতরোল ঝাউ-বনের সম্মোহনের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন ঐ মহিলা তার ফেলে-আসা জীবনের খোঁজে—যে জীবন অকুতোভয়, ভালবাসা আর বিষাদের উষ্ণ আর ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে-ওঠা।

এক পোড়োবাড়ির মতন আবহমান নিয়তির মধ্যে কিছুকাল বেড়াতে-আসা যে-কোনও মানবপুত্রের মতন আমি শুধু লক্ষ্য করছিলাম একটি মেহগিনি-রঙা ফোটোস্ট্যাণ্ডে একটি রঙীন সাম্পানের মতন উত্তাল এক কিশোরের হাসিমুখ যেখানে অসংখ্য বাড়ির মধ্যে একচিলতে আকাশের মতনই জীবন দরিদ্র ছিলো না, জীবন বিস্তীর্ণ হয়ে উঠতে, কখনও সঙ্কোপনে কখনও অমনোযোগে তার ডালপালাগুলি পারিপার্শ্বিকতার দৃষ্টির গভীরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলো।

এদিকে স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠছিলো যেমন জীবন্ত হয়ে উঠছিলো ঐ ছবিটির কাছাকাছি রাখা এ্যাকোরিয়াম-তে মাছ, বেড়ে-ওঠা কিচেন গার্ডেন। ভারী হয়ে নেমে-আসা একটুকরো অসহায় অস্তিত্বের কাছাকাছি জীবন নিজের মতন মগ্ন, অসহনীয়, সুন্দর হয়ে গুছিয়ে উঠছিলো।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরী

কারা পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়
পা নেই এবং শব্দ—
চাঁদ ছোঁয়া চারদিকে বরফী চাদর—
আলো নেভা সমস্ত বাড়িতে
একদল পরী নেমে আসে—

মেয়েদের স্তন থেকে অভ্যাসে কাপড় সরে যায়
নরম হাঁটুর ফাঁকে ডানা কেঁপে ওঠে
সমস্ত ষ্টিরিয়ো থেকে চৌদুনে সেতার—

অগোছালো বিছানা থেকে
সব স্তন চাঁদে ডুবে যায়—
পরীরা ফিরে যায়—

ঘাস বোঁটা স্বপনের
সারারাত শিশিরে শিশির

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

অভ্রবর্ণ হাসি

যার ওপরে পতাকা উঠছে ওটাই
মেরী টেইলরের পাহাড়, এই রোয়াম—
বলতে বলতে বিল্লু সিং ঘুরিয়ে নেয়, মাটাডোর—
ওই রাখামাইন্‌সের পথ।
চাইবাসা, মুসাবনি না
ধলভূমগড় কি ধারাগিরিও না
এখন শুধু রোয়াম, সবুজ পাহাড়
এখন শুধুই জাদুঘোড়ার রঙ্কিনী দেবীর মন্দির।
নিচে জলধারা—পাহাড়ের ঊর্ধ্বমুখী পথ—নির্জনতা—
চড়া রোদ—পায়ে আলগা পাথরের টান
নিশানচিহ্নিত ওই শীর্ষে গুহা
গুহামধ্যে রঙ্কিনীর অভ্রবর্ণ হাসি।
না।
আমরা ছ'জন
কেউ অর্ধেকের বেশি ওই পথে উঠতে পারি নি
পা টিপে মাথা নিচু করে ফিরেছি ঘাটশিলায়

সন্ধিনীর বাগানে যখন পাতাপোড়ানোর গন্ধ—
অন্ধকার
সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে চোখ রেখে বলেছি—
পরের বার নিশ্চয় পৌঁছুতে পারব চূড়োয়
এবারেও আমাদের মুঠোয় রইল রাত মোহানা—
সুবর্ণরেখার বালি।

কমল চক্রবর্তী

ফুলচোর

নদী পার হয়ে একা গোপনে এসেছে ফুলচোর
আবার ফিরেছে জলা ধরে
ব্রীজ দেখে বুঝে গেছে আর কোন ফুল ঠিক তত সত্য নয়
গাছে থাকবে, ব্রজে থাকবে, আলো থাকবে জলের লহরে

নদী পার হয়ে একা গোপনে ঢুকেছে ফুলচোর
কখনও ফিরেছে হাত ভরে
ধুলো ছিল, নেংটু ছিল, ঝর্ণা ছিল, সারারাত ভয়
মনে পড়ে পাখি ধরতে এসেছে পাখমারা
ওং পেতে ছিঁচ অন্ধকারে

শহরে রটনা হোল ফুলচোর
গোপনে ঢুকেছে ছল করে।

বাদাম পাহাড়ের ট্রেন

সমস্ত ট্রেনেই কিছু ভয় থেকে যায় কিছু উটকো ধুলো
শুধু বাদামপাহাড় ট্রেনে ঝর্ণা, অর্জুন বন একই সঙ্গে নাচে
দীর্ঘ পথ ফুরিয়ে যাবে না ঠিককথা
কারণ পাহাড় থেকে প্রতিদিন সূর্যপায়রার ঝাঁক ঢাকে অন্ত
বিকেলের মনস্ক-শৃঙ্খল

হয়ত ট্রেনে যাত্রা নেই মহুয়াই প্রধান
হয়ত ট্রেনে যাত্রী ওঠেনি রোজই শূন্য যায়
শালবল্লা বোঝাই, শাদা কাশ, বনের বামাল
যত বিকশিত সাঁওতাল রমনী

সমস্ত কামরায় ধস্ক, ছড়ানো ছিটোনো তার প্রাণ
ইঞ্জিন, বয়লার, গ্যাংম্যান একদা মদের টানে এসেছে ড্রাইভার
শুধু ট্রেন বাদামপাহাড় যাবে ফিরে আসবে চৈত্রপ্রভাতে
ফাঁকা কামরা মাঝে মাঝে দু একজন বাদামপাহাড়ী

যৌবন ভালবেসে রমনী সেজেছে দীর্ঘ ট্রেনে
কখনও পাহাড় থেকে উলু দিয়ে পুরুষ খেদায়
কখনও ওদেরই হাতে পরাজিত ইঞ্জিন-ড্রাইভার
বেলা বেড়ে গেল শুধু ঘাস উঠছে কামরায় কামরায়
শুধু পাতা না ঝরার অভিমান
যত ঘোরো, যত ভুলে থাকো
শুধু ভালবাসলে সব ট্রেন বাদামপাহাড়।

সুব্রত রুদ্র

অন্নশরীর

সবাই বলে: 'আমি তোমার
অন্নদাতা।
চিৎকার ক'রে বলো অন্নদাতা অন্নদাতা'

—আজ খেতে দাও কাল ঠিক ডাকবো।
হাওড়া ব্রীজের মাথায়
দাঁড়িয়ে
গলার শির ছিঁড়ে
ডাকবো 'অন্নদাতা অন্নদাতা'…

সে ডাকে গঙ্গা শিউরে উঠবে
মাথার আকাশ কেঁপে উঠবে
ডাকতে ডাকতে
ডাকতে
আমার মাথা ঘুরে যাবে

ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে
তোমাদের অন্নশরীর পুড়ছে

সূচ

স্থচ···বিঁধে থাক কুহুমে
পাতা, লতা ও মাটির কাছ থেকে বুঝে নাও
জন্মের সৎ অভ্যাস
ক্রুত গোপন শঠতা
ফুলের নিঃশ্বাস থেকে অরচিত গান
স্থচ···ঘুমিয়ে থাক কুঁড়ির ভিতর
দেখ ওর ধীর প্রভাময় বিস্তার
পাপড়িদের ভালবাসা ও মমতার কথা
পাপড়িদের নখের আঘাত, ষড়যন্ত্র ও রক্তপাতের
কথা জেনে তুমি সেলাই কর একটি কবিতা

থার্মোমিটার

আমি থার্মোমিটার দিয়ে লিখি
সমুদ্র ওকে ছুঁয়ে যাও
বড় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াও ওর সামনে
বিদ্যুৎ ওকে স্পৃষ্ট করতে পারেনি—
সে ওর পুগোয় নিযুক্ত থাকুক
খরার আকাশ ও তপ্ত বালুর ঢেউ
ওকে বন্ধুত্ব দিক
আর ভালবাসা পুড়তে পুড়তে, সব
দহনের মধ্যে জড়িয়ে ধরুক ঐ থার্মোমিটার।

দুটি কাল হাঁস

মায়া ফোয়ারার জল ডেকেছে আমাকে :
দেখেছি অনেক দূর থেকে তার আভা
ছায়ার আঙুল করে অস্পষ্ট ইশারা
আবছা চিবুকে থাকে হাসির সংকেত—

বিছানায় খেলা করে কাল দুটি হাঁস
ফোয়ারার দুটি জ্যান্ত সাপ ঠোঁটে নিয়ে।
বিষের উদ্যাম ফোঁটা ঝরে রাত্রিবেলা :
ঘুণের পোকারা বাঁচে তার রস খেয়ে
কবরের নীচে পড়ে থাকা যৌনকেশ
রাত্রির বাতাস টেনে বাইরে এনেছে
নাজনীন, আমি শুয়ে থাকি পাশাপাশি
ঘনকাল গুচ্ছ কেশ পুঁতেছি মাটিতে।
বৃষ্টির গরলে ভাসে কাল দুটি হাঁস
ফোয়ারার দুটি জ্যান্ত সাপ ঠোঁটে নিয়ে।

আলো

আলোকিত হাঁস দেখি ডানার শোভায়
পশ্চিম আকাশ খুব উজ্জ্বল করেছে—
এবং করেছে যেন মারাত্মক স্থির।
আলোকের থেকে অন্য আলোকের জলে
ও হাঁস তোমার ক্ষিপ্র সন্তরণ দেখে
ভাবি আজ মৃত্যু বুঝি সমাসন্ন হল···
এত ভীষণ সহসা তীব্র নেমে আসা
পায়ের ছটায় ভাঙ্গা তেজস্ক্রিয় মেঘ
গড়ায় পিছনে, নীচে, সামনে ও পাশে—
অনেক সহস্র জন্ম এবং মিথুন
টানা হিংস্র নাচ, আর দ্রুত মুণ্ডপাত
অকথ্য উলঙ্গ সব দীর্ঘ ঢোল-যাত্রা
বাঁশির সহাস্য লাফ, ঘুঙুরের দোল
নিয়ে আজ তুমি নেমে এসেছ আলোকে।

ভালোবেসে

ভালোবেসে নামতে পারি
উপত্যকার বিহ্বলতায়
চোখের জলে, নদীর কাছে
সুখের কাছে, তপ্ত কথায়।

ভালোবেসে নামতে পারি
সর্বনাশের ধুলোর দিকে
গোলাপ তুমি অট্টহাসির
নাচাও কেন ঝর্ণাটিকে ?

ভালোবেসে নামতে পারি
আঁধার রাতের অন্ধকারে,
মেঘের দুপুর জড়িয়ে আছি
বকুল হাওয়ায় বারে বারে।

সারাজীবন একটি খেলা
বুকের ভিতর, মর্মতলে,
কোন্ বিরহের দু'কূল জুড়ে
সইগো তোমার আগুন জলে।

সন্ধে ৬টা-৭টা

বলেছিলে, সন্ধে ৬টায় এসো,
৭টায় গিয়ে
আমি অন্ধকার বাজনার তার ক্রমহীন—
হাওয়ার আঙুল এসে ছুঁতে গিয়ে
ভ্রমে গান বেঁকেচুরে যায়।
বাড়িটার কোণে কোণে
নিশ্চুপ বিদ্যুৎ আর ভিজে পর্দায় আঁকা পাখি
দেখেছিল নাকি তাকে ?
আমবনে কুয়াশায় ঝরে পড়া বউলের স্মৃতি !

আমি তো এখনও বলি—
অন্তত একটি জন্ম দে আমাকে,
প্রদীপের কোল থেকে পরতে পরতে যা,
ছড়িয়ে যা শিস—
অসংখ্য আঙুলে ছোঁ আম'য়, খুঁজে দিস
ফাল্গুনের মতো নীল ময়ূর একশোটা।

ফাটা ঠোঁটে বহুবহুক্ষণ পরে
বৃষ্টি পড়ল এক ফোঁটা।

অতিশহর

তোমার শুনের বোঁটায়
লুকিয়ে আছে শহরের বীজ।
আমি জানি, আর ভয়ে ভয়ে থাকি।

দিনের যে সময়টুকু তুমি দোকানের শো-কেসে
নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, তখনই ভয় বেশি।
একবার ওই বীজ খসে পড়লেই
শহরের ভিতরে গজিয়ে উঠবে আরো শহর
স্কুলের ভিতরে মুদিখানা, মুদিখানার ভিতরে
প্রাইভেট বাড়ি,
আমাদের শোবার ঘরে লুম্পেনরা তাস খেলবে সারারাত
আমি বারবার ছুটে গিয়ে
তাদের জন্যে কিনে আনবো মদের বোতল, আর
তুমি বারান্দায় বসে, অন্ধকারে
লরিচালকদের পা টিপে দেবে।

লিখি

চশমাটা ভেঙে যাওয়ার পর আর কথা বলি না
বসি, হাঁটি, চলাফেরা করি, শুই
কিছুই দেখিনা
গাঢ়, অবচেতন, একক
স্বভাব, উন্মোচন
এ' কিসের প্রতিবাদ

জন্মের পর উত্তোলিত মুষ্টি
ধুলো
শেষ, ছাই
এর মধ্যকাল
ঝড়, নীরব

স্পর্শাতুর
জীবন

দেখতে পাইনা
কলমের কালি জিভে ভিজিয়ে
লিখি
শান্ত সাদা পাতায়!

চলো, চলো

অন্ধকার হ'য়ে এলে
আলো জ্বালাইনা
উঠি, দাঁড়াই
ঘরের এক প্রান্ত থেকে
আরেক প্রান্ত
হাঁটি, কেবলই হাঁটি
অন্ধকার, আরো অন্ধকার

আমার কাঁধে কে হাত রাখে
বলে : এইতো যুদ্ধ, চলো, চলো
হাঁটি, কেবলই হাঁটি
হাত-পায়ের শৃঙ্খল ঝনঝন
জলি, পুড়ি, আরো পুড়ি
অন্ধকার, কী অন্ধকার
জ্বলতে জ্বলতে পুড়তে পুড়তে
আলো
উথলে উঠুক
শরীর
রক্তের ভিতর !

রাণা চট্টোপাধ্যায়

বারই নভেম্বর

বারই নভেম্বর খুব দুঃখে কেটেছিল
আমাদের অনেকদূর থেকে বয়ে আনতে হলো
শীর্ণ যুবতীর মৃতদেহ কুয়াশা ও রোদ্দুরের ভেতর

বারই নভেম্বর আমাদের পরিচিত দৃশ্যপটগুলি
খানখান হয়ে যাচ্ছিল পড়ন্তবেলায়
বুকের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল জন্মলতা

আসলে কেউ আমরা বিশেষ কথা বলছিলাম না
যেন অরণ্যের গভীর অভ্যন্তর থেকে
একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাকেরমতন দুঃখেরা
ভেসে আসছিল অগুরু গন্ধে

বারই নভেম্বর এসেছিল খুব সাধারণ
তবু খুব অসাধারণ ভাবে কেটে গেল
করুণ মৃত্যু দিয়ে ছুয়াশায় কুয়াশায়।

দাগ

তা-অনেকদিন হ'ল, এ-বাড়ি যেদিন উঠে আসি ;
মনে পড়ছে, খটখটে রোদ ছিল, গৃহপ্রবেশের শাঁখ
বেজে উঠেছিল।
তখন-তো ঘরদোর মুছে নিয়ে যেত আলো,
ধীরে ধীরে শরীরের দাগ
দেয়ালের চুনকাম ঢেকে দল।

দিন-দিন সেই দাগ বড়ো হচ্ছে,
বেবড়ে যাচ্ছে ছিটকে-লাগা দাগ,
তাই এখন বিকেল-সন্ধ্যের ফাঁকে
আলো যখন আলো নয়, অন্ধকারও নয় অন্ধকার,
দেয়ালের চুনবালি নড়ে ওঠে,
নড়ে ওঠে গোপনতা, আর একটু বেবড়ে যায় দাগ।

গেরস্থালি

বাড়িটার দিকে চাইলে তাঁর বুক ভ'রে ওঠে,
হাজার হ'ক, নিজের হাতেই গড়ে তুলেছেন
ভিত থেকে ছাত, চিলেকোঠা।

ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন সবকিছু,
ছায়ার মতো ঘুরছি তাঁর পিছনে-পিছনে, দেখছি তাঁর মুখ
চকচক ক'রে উঠছে, উঠবেই তো, তবু যেন
কী একটা আড়াল থেকে যাচ্ছে—

আমি তো ছায়ার মতো, তবু তিনি আমাকেই
তকতকে গেরস্থালি খুলে খুলে দেখাচ্ছেন,
অ্যালবামে ছবি দেখছি নানা বয়সের,
নানা মাপে বড়ো হয়ে ওঠা।

কী যেন আমার চোখে খুঁজছেন, স্বীকৃতি ?
দেরাজ হাতড়ে তিনি দেখাচ্ছেন হাতের ম্যাজিক,
হঠাৎ টানতে গিয়ে দেরাজে পাচার ক'রে রাখা সব
ছিটকে পড়ে, দেখি সেই হাতে চোঁচ ঢুকে গেছে,
ততক্ষণে মোজেকে ছড়িয়ে পড়ে
অন্য এক বড়ো হয়ে ওঠা।

স্বরবর্ণমালা

ট্রেনের টিকিট কাটা, কালই ভোরে চলে যেতে হবে,
এ-কথাটা সারাদিন পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করেছে,
খুঁজেছে একটু নিরিবিলি, যাতে চাড় দিয়ে
আলগা ক'রে দিতে পারে শব্দের উৎসমুখে
চাপা-দেওয়া বুকের পাথর। ঘেঁষতে দিইনি তাকে,
প্যাকিংয়ের ভাঁজে-ভাঁজে টুকিটাকি সংলাপে
আড়াল টেনেছি সারাদিন।

এখন এ-অন্ধকারে তাকে আর দেখতে পাইনা, তার
কান্নার আওয়াজ শুধু নড়ে,
পাথর ঠেলে উঠে আসে স্বরবর্ণমালা, এসে
বুকে মুখ ঘষে, তবু
বুঝে নিতে চাই সেই কথা
শিখতে গিয়ে শেষমেশ হয়তো-যা শিখি, সে তো
নড়বড়ে ধ্বনি আর যুক্তাক্ষর মিলে
বড়জোর শিল্পের শিকার।

দুঃখ নিয়ে খেলা

সেই এক গল্প—
যে-ভাবে সে চেয়েছিলো, ঠিক যেন সে-ভাবে হ'লো না ;
যেখানে বইয়ের ফাঁকে বুকমার্ক গোঁজা ছিল,
সেখানে খুলতেই হাওয়া ফরফরে পাতাগুলো

ওলটপালট ক'রে দিল ; সে-জায়গাটা কিছুতেই
খুঁজে পেলনা সে।
না-পাওয়ার দুঃখ নিয়ে খেলেছিলো কিছুদিন,
বেশ লাগতো, মাঝেমাঝে ঘাই দিয়ে চলকে যেতো জল—
আজকাল এ-খেলায় জুত পায়না আর,
দুঃখ কবে মেদ হয়ে শরীরে জমেছে ;
সিঁড়ি ভাঙতে হাঁপ ধরে, দেহের ওজন টানে নীচে।

আসতে যেতে তাকে দেখি, বসে আছে জগদ্দল,
প্রতিদিন একটু একটু ক'রে যেন
চেয়ার-টেবিল-কাঠে মিশে যাচ্ছে, খেয়ে ফেলছে তাকে।

অনাবিল পরিবেশ

এ-শহরে ছক কেটে গাছ পোঁতা হচ্ছে, যাতে
দূষিত বাতাস অনাবিল হয়ে ওঠে,
নথিপত্রে গোঁজা মুখ তুলে
শ্বাস টেনে নেওয়া যায় ফুসফুসে
আরো একটি দিনের নিয়মানুবর্তিতা, যাতে
মজ্জা থেকে পরিশ্রুত সচ্ছলতা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে,
পরিবেশ অনাবিল রাখে।

রাস্তার দুধারে গাছ, সারিবাঁধা কেয়ারী বাগান,
অথচ বৃষ্টির পরে শুনতে পায়না কেউ
শোনার ফুরসৎ নেই,
ভিজে-ভার পাতা থেকে ফোঁটাফোঁটা জল ঝরছে টুপটাপ—

সোঁদা মাটি, নিমফুল পায়ে পিষে
কী একটা ওদা গন্ধ ভাসছে বাতাসে
কিসের আভাস, সেকি অন্ধকারে হাট-করা নগ্নতার ?
কার মুখ ঢেকে রাখে অন্ধকার, কিসের নগ্নতা ?

এ-সব প্রশ্নের মুখে খিল তুলে
স্বপ্নহীন ঘুমে স্নায়ু কালকের জন্যে বেশ
চাঙ্গা ক'রে নেওয়া যাক,
গুছিয়ে তুলবো ঘরে জুঁই-চাপা-গোলাপের গন্ধ,
জানলা দিয়ে অনাবিল পরিবেশ উঁকি মেরে যাবে

জোঁক

এখন বৃষ্টিতে সব খানা-খন্দ-ডোবা ভ'রে আছে,
কিশোর ফেলছে নুড়ি টুপটাপ, দুলে উঠছে জল,
দুলতে-দুলতে বেড়ে যাচ্ছে বৃত্ত থেকে বৃত্তের পরিধি—

ঘনঘাস, ঝাঁকড়া বাদাড়, ঝোপ
চাপ চাপ পৃথিবীর উর্বরতা থমকে আছে,
কী-যেন, কিসের নেশা, কেটে যাচ্ছে নাকি ?

কিশোর তাকিয়ে দেখে
রক্তের গন্ধ পেয়ে ঘনঘাস থেকে
স্যাঁতসেঁতে দাওয়ায় জোঁক উঠে আসছে,

কিশোরের চোখ জ্বলছে, জ্বালা করে, বুজে ফেলে চোখ,
শিরাউপশিরা জুড়ে রক্তের মৌতাত শুধু,
আর কিছু নেই। রক্ত চুষে চুষে জোঁক চুর, ফুলে ঢোল—

কখন-যে বৃত্ত থেকে
বৃত্তের পরিধি বেড়ে চলে গেছে নজর ছাড়িয়ে।

যন্ত্রণা থেকে

লক্ষ্য পৌঁছেছিল ঠিক
তীরবিদ্ধ হয়েও ছিল পাখিটা
কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল পাখি

কেবল ডানার পালক ছুঁয়ে মৃত্যু পর্যন্ত না পৌঁছেই—
যেখানে হোক পড়ে রইল ধনুকের তীর।
শুরু হল অর্ধমৃত পাখির ঝটপট ঝটপট
এডাল-ওডাল ওড়াউড়ি।

এখন যেদিকে চাই

এখন যেদিকে চাই সব স্বপ্ন স্বপ্ন নয়
স্বপ্নভঙ্গ
কারো কারো চোখ থেকে অনর্গল বৃষ্টির মতোন
ইহকাল পরকাল ভিজিয়ে
ঝরে পড়ছে পথের ধুলোয়

এখন যেদিকে চাই সব দৃশ্য দৃশ্য নয়
দৃশ্যাহত
কেউ কেউ আর দেখতে না পেরে অকাল সূর্যাস্তে
নিজস্ব রক্তক্ষরণে পা ফেলে ফেলে নীরবে
দুঃসহ চিহ্ন রেখে ফিরে যাচ্ছে—ঠিকানা জানেনা

এখন যেদিকে চাই সব জীবন জীবন নয়
জীবন্মৃত
ক্রাচে ভর করে বড়ো কষ্টে নিজেকে
শ্মশানের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে

মিলন

অনেকদিন
একটা হেমন্তকাল খুঁজছি
কখনও একা একা, কখনও লণ্ঠন নিয়ে
একটা হেমন্তকাল
একটা লাবণ্য

অনেকদিনের ইচ্ছে
মালা গাঁথবো
মানুষের পাশে মানুষকে মালা ক'রে মিলন ক'রে
একটা উৎসব

প্রজাপতি

প্রজাপতি, কাকে কাকে ছুঁয়ে
ছুটে বেড়াও
কার গায়ে কেমন গন্ধ ছিল রঙ ছিল
ঘাস ছুঁয়ে ঘাসের প্রাণ কাকে দিলে ?

প্রজাপতি, মৃত মানুষের গায়ে ব'সেছো ?

হাড়

ও ভাই নীলকমল, লালকমল
আমার রক্ত পুড়ে গেলেও
আমার হাড়ে বজ্র হবে আমার হাড়ে বাঁশি হবে
তবে বজ্রকে লুকিও না গাছের কোটরে
বাঁশিকে বেঁধোনা কচি কদমের ডালে
এক ভাই বজ্রকে বুকে বাঁধো
এক ভাই বাজাও বাঁশি

আধুনিক বাংলা কবিতা

বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতা সম্পর্কে দু-ধরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম ধরণটির লেখকদের সামনে থাকে কোহেন যা ডিউটচ-এর বইগুলির ধরণ, পৃথক কবি বা নির্দিষ্ট সময়-ক্রমকে নিয়ে কয়েকটি মাত্রই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। এক দশকেরও পরে পুনঃ প্রকাশিত হলো যে গ্রন্থ সংকলন, 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস,' তার সমধর্মী দুটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আছে। প্রয়াস হিশেবে 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' এদের পূর্বজ, যদিও দ্বিতীয় 'পরিবর্তিত সংস্করণে' পরিবর্তন ঘটেছে যথোচিত ভাবেই অনেক। নতুন সংস্করণে 'ইতিহাস' বিভাগটিতে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতার আততি-তীব্র সম্পর্ক থেকে ষাট দশকের কবিতা পর্যন্ত আলোচনা বিভিন্ন আলোচকের মাধ্যমে বিস্তারিত। ছন্দ ও রীতি সম্পর্কে দুটি পৃথক আলোচনাও সম্পৃক্ত। 'অন্যসঙ্গ', বিভাগে একালের কবিতা পাঠে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করেছেন প্রবন্ধ-কারেরা। কাব্য পাঠকের প্রতিক্রিয়া, পরিভাষা, অনুবাদ, কাব্যনাট্য, কবিতা পত্রিকা ও শব্দ, পুরাণ, মাস্ক : বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হয়েছে আলোচনা। অন্তিমে সংযোজিত জরুরি নির্বাচিত পঞ্জী। অন্যমনস্ক ও বন্ধুবৎসল সম্পাদনার বাঙালী জগতে এ-সময়ের গণ্যতম দুই কবি-সম্পাদকের এই চেষ্টায় রয়েছে নির্বাচনী মন ও পারিপাট্য। যদিও এইসঙ্গে বলতে হয় 'ইতিহাস' পর্বে অলোক রায়-এর 'সন্ধিক্ষণের কবিতা' প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতা' (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)-র পরবর্তী হওয়া কালক্রমগত ভাবে উচিত ছিল। অলোকরঞ্জনের 'আধুনিকতার সংজ্ঞা' হতে পারতো বইটির প্রধান ভূমিকা। 'দশক' বিভাজনের বিপক্ষে বিভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হলেও, কবিতা-আলোচনায় স্বীকৃত এই রীতিটিকেই মান্য করেছেন সম্পাদকরা।

অতি-নিকট কালের কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় অনেক ভুল বোঝাবুঝি, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কাব্য-বিরহিত সামাজিক স্মৃতি কাজ করলেও কবি ছাড়া অন্য কেউ এ কাজে ব্রতী হন না। যদিও এ কাজে যদি কোনও ক্ষতি হবার সেটি কবি-সমালোচকদেরই হয়। সেই ঝুঁকি নিয়েই চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণীন্দ্র গুপ্ত। আলোচক হিশেবেও এঁদের ভিন্ন ভিন্ন মান ও প্রতিন্যাসের

দিকগুলি সতর্ক পাঠকের পূর্বাহ্নেই স্মরণে থাকতে পারে। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত—যাকে 'নির্ভার কবিতা' বলে কবিতার সেই রূপে আস্বাদন। দেবীপ্রসাদ কবিতা-র ভিতর থেকে বাঙালী পরম্পরাকে খুঁজে নিতে চান। আর মণীন্দ্র গুপ্ত যে 'বিষয়' সন্ধানী সেটি 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র ভূমিকাতেই ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যত 'ইতিহাস', গ্রন্থটির এই প্রধান পরিচয়কে মনে রেখেই প্রণবেন্দু চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন চল্লিশের কবিতার আবহ ও স্বকীয়তা আত্মস্থ হয়েছে যাদের ভিতরে সেই কবিদের। সমাজ-সচেতনা চল্লিশের একটি বিশেষ দিক—পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসু ও কিছুটা বিষ্ণু দে-র অন্তরঙ্গ শান্ত লিরিকিতাও মেলেছে তার লাবণ্য। চল্লিশের অনেক লুপ্ত নাম আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন শেষের এই প্রবণতা সূত্রে। 'এঁরা জানতেন, অবক্ষয়ের মধ্যেও কিছু মূল্যবোধের কথা অশোভন নয়'—'আধুনিকতার সংজ্ঞা'য় অলোকরঞ্জন উচ্চারিত চল্লিশের গ্রাহকসত্তা-বিভাবিত এই চরিত্র নির্ণায়ক উক্তি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের প্রবন্ধের ব্যাপ্ত আলোচনায় লাভ করে যে প্রস্তুতি, সংগত ভাবেই মানবিকতার আভায় তার উদ্ভাসন। যে মানবিকতার (উল্লেখযোগ্য: মার্কসপন্থা ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মৌলমানবপন্থা, প্রায় সমানুপাতিক অভিভাব আনছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা অরুণকুমার সরকারের মতো কবিদের কাছে) সূত্রে সামগ্র্য প্রস্তুয়মান তাকে চেনাতে তিনি তাঁর, নব্য রোমান্টিক প্রাণদ মনের পরিচয় রাখেন। ওয়ার্ডস্বার্থ 'গীতিগুচ্ছের' দ্বিতীয় সংস্করণে জানিয়েছিলেন 'poetry is the image of man and natnie ; বলেছিলেন কবি বিবেচনা করেন মানুষ ও প্রতিবেশকে পারস্পরিক অভিভাব-সঞ্চারী রূপে (as reacting and reacting upon each other)। প্রণবেন্দুও জানান, 'প্রত্যক্ষ ভাবে মূলসমস্যাস্পর্শী কবিতা রচনার রীতি চল্লিশ দশকের মধ্যেই বোধ হয় সীমাবদ্ধ রইল।'

চল্লিশের কবিরা প্রণবেন্দু-র বয়ঃকালীন নন বলেই বিবেচনা সংক্রান্ত যে অসুবিধেগুলোর উল্লেখ আগে করেছি, সেগুলোর স্পর্শ তাঁকে লাগে না বড় একটা। সে দিক থেকে অন্যতম সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি পঞ্চাশের অন্যতম কবি ও বিশেষ প্রবণতাপুঞ্জের ধারাবাহী—কিছু অসুবিধে রাখেন পাঠকের সামনে। পঞ্চাশের কবিতার আলোচনায় দেবীপ্রসাদ-কে পুরনো দিনগুলির নস্ট্যালজিয়ায় ঈষৎ আচ্ছন্ন মনে হয়—আবার এই নস্ট্যালজিয়া হয়তো অন্য দিক থেকে উপকারীও। কারণ, পঞ্চাশের কবিতা অনেকসময় কবিদের জীবনযাপনের উৎকেন্দ্রিকতার সমাচারে ছাপিয়ে যেতে

চেয়েছে সৃষ্টিকে, পাঠকের বোধকে নানারকম সংস্কারে রেখেছে বশীভূত ক'রে, অনেক সময় এই দশকের নমিত শ্রীকে বিদ্ধ করেছে তীক্ষ্ণ ও শীৎকারকুটিল রব। কবিতাপাঠকমাত্রেরই জানা আছে, হার্বার্ট রীড আধুনিক কবিতাকে রোমান্টিক কবিতারই পরিণাম ব'লে ভেবেছেন। দেবীপ্রসাদের ভাবনার অভিমুখটিও ঐ দিকেই ফেরানো। পঞ্চাশের 'একলার পৃথিবী'-র স্তব্ধ, অন্তর, নির্বিড় আবহটিকে বিভিন্ন, তখন-জায়মান, কবিদের উল্লেখের সাহচর্যে চিনিয়ে দেন। এরপর সময়-ঘূর্ণায় যে উচ্ছি্ত পরিপার্শ্ব জমেছিল ভিন্নতর 'অতি-আধুনিকতা'র সেটি যে সেই দশকের প্রস্তুতিপর্বের লোকায়তনিক থেকে ছিন্ন হয়ে গেল, সে-ব্যাপারে বলতে গিয়ে পাঠক দেবীপ্রসাদের বিষণ্ণতা বুঝতে পারবেন।

হ্যারল্ড রোসেনবার্গ বলেছিলেন, 'Basically the artist paints the struggle between himself and the subject'—এটি যেন ষাটের কবিদেরও ভাষা-কাঠামোর প্রধান সংকট। এ-কারণেই সেই সময়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে যেমন দীর্ঘকবিতার দিকে যেতে হয়, অন্যদিকে কালীকৃষ্ণ গুহ কিংবা ভাস্কর চক্রবর্তীকে খুলে খুলে দেখাতে হয় আত্ম-পুরাণ। দু-ধরনের এই আততিকে ষাট-দশকের কবিতা বিবেচনায় তুলে ধরেছেন মণীন্দ্র গুপ্ত। অন্যেরা কবিদের নামোল্লেখে যত বিশদ, মণীন্দ্রবাবু বিভিন্নধর্মী কবিতার উল্লেখে মুখরিত সময় ও আবহকে গ'ড়ে দিতে তেমনই যত্নবান। অবশ্যই তাঁরও পক্ষপাত লোকায়তে, মৌল-প্রতিমায়, নিসর্গ-রক্তিম কবিতায়। প্রসঙ্গত মনে হয়, চল্লিশের কবিতায় যেমন, তেমনি ষাটের কবিতাতেও মার্কসবাদী প্রত্যয় অনেক কবির ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'পরিচয়' 'সীমান্ত' বা 'সাহিত্যপত্র'কে ঘিরে, কিছুটা বিষ্ণু দে প্রতিম অথবা রাম বসু-র অনুসারী কবিতাধর্মের দিকে অনেকেই। এদের সম্পর্কে হয়তো আর একটু আলোচনা কাম্য ছিল। অবশ্য আলোচক ষাটের কবিতা সম্পর্কে আলোচনার দুটি ঝুঁকি সম্পর্কে স্পষ্টতই সচেতন। যাঁদের পঞ্চাশের কবি বলা হয়েছে তাঁদের অনেকেই বিকশিত হয়েছেন ষাটের দশকে। যেমন, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অনেক কম লিখে বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত। বিনয়-উৎপল-প্রণবেন্দু পরবর্তী দশকের কবিদের আঙ্গিক ও বিন্যাসে বিশেষ প্রভাবশালী, কিন্তু এ-বিষয়ে পঞ্চাশ ও ষাট উভয় দশকের আলোচকরা প্রায় নীরব।

'রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙলা ছন্দের রূপকার'—দীপংকর দাশগুপ্তের এই ভাবনাটিকে আরেকটু বিস্তৃত ক'রে 'আধুনিক কবিতার' বলা যে যায় সেটি

বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ও 'আধুনিক' কবিতার গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব-বন্ধুর পন্থায় অনেক ভাবনার চলাচল লক্ষ ক'রে। দীপংকরের মেধাবী প্রবন্ধটি ছাড়াও এ-বিষয়ে রয়েছে দুটি প্রবন্ধ : দেবীপ্রসাদের 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতা' ও রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর 'প্রধানত তিরিশের কবি ও রবীন্দ্রনাথ'। দু-জনের আলোচনাতেই রূপকল্প সচেতন, ফর্মালিস্ট মনোভঙ্গি অগোচর থাকেনা। তবে দেবীপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার রূপকল্প ও মনোভাবের গহন গ্রন্থনায় অনেক গাঢ় ও অন্তপুঙ্ক্ষ। আর তাঁদের দায় আরও দুরূহ, কারণ তাঁদের সামনে অন্তত সাতজন তিরিশের কবির ব্যাপ্ত, গূঢ়, জটিল ও আলোচিত কবিতাবলী অপেক্ষারত। এই যে দুরূহতা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সরলতা ও সামান্যীকরণের ব্যস্ততায় লঘু ক'রে তুলেছেন। তিনি বোধ হয় স্মরণে রাখেন নি তাঁর আলোচনার শিরোনাম 'তিরিশের কবিরা' নয় তিরিশের কবিতা'। এ-কারণেই বুদ্ধদেব বসু-র উপর বিদেশি কবিদের ক্রমান্বয় অভিঘাত ও অনুস্তরণ ও পরিনামে রবীন্দ্র-আবহে পুনঃপ্রবেশ ছাড়া কিছুই দেখেন নি তিনি। বুদ্ধদেব বসু-র অনুবাদের আত্মগত গরজটিকে অনুধাবন করেন নি কবির শিল্পগত ভাবনার বিবর্তনের নিরিখে। আধুনিক মননের একটি শর্ত—মার্লো পঁতি যেমন দেখিয়েছেন—'ambiguous mode of existing' কে ফলিত করা। বিকাশমান সেই প্রস্তুতির শর্তে এলিঅট আঁরাগ অভিভাবিত বিষ্ণু দে বা হপকিন্স-রণিত অমিয় চক্রবর্তীই নয়—বুদ্ধদেবের মতো প্রায় সব প্রথম 'আধুনিক কবিরা' রবীন্দ্র-মানসের সংকট গ্রহিষ্ণু মননের দিকে অর্পিত হয়েছেন এতো আজ স্পষ্ট-সত্যি। প্রকৃত পক্ষে যেখান থেকে কবিতার আধুনিকতা, সেটি যতটা না বিষয়ে বা আবহ-অভিঘাতে, তার থেকে অনেক বেশি নতুন ভাষা-সন্ধিৎসায়। বিষ্ণু দে একে বলেন 'আত্মসচেতনতার এক কর্ম'। আধুনিক কবিতা জন্মের ইতিহাসে কবির আঙ্গিক ও ভাষা যে বিচিত্র ভাবে সৃষ্ট হয়, এ-কথা জানান জীবনানন্দ। চিত্রকল্পে কবিতা-ভাষার ভূমিকা কীভাবে রূপান্তরিত বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দের ভাবনাকে কেন্দ্রে রেখেই সেটি দেখিয়েছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভাষার মুদ্রা—আধুনিক কবিতা'য়। তবে চল্লিশ দশকের স্বরায়ন পর্যন্তই তাঁর অনুসন্ধান।

'অনুষঙ্গ' পর্বে যে তিনটি প্রবন্ধ আমার কাছে বিশেষ মনোযোগের ব'লে মনে হয়েছে তার একটিতে আছে নিরাবেগ শ্রম। অলস ও অতিকথন সিক্ত এই দেশে রঞ্জিত সিংহের 'সাহিত্য পরিভাষা' চেতিয়ে তুলবে কবিতা-পাঠককে।

একালের কবিতার প্রধান কবিদের কাব্য-আলোচনায় মুখ্যত ব্যবহৃত হয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন কবিদের অনেক পরিভাষা, যেগুলি অনুবাদেও বিভিন্ন হয়েছে। তবু এর মধ্যেও কিছু পরিভাষা মোটামুটি স্থায়ী হয়ে উঠেছে। এ-রকম বেশ কিছু পরিভাষা মূলের অর্থ সংগতির বিচারে উপস্থাপন করেছেন রঞ্জিত সিংহ। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে 'ইমেজ' শব্দে শব্দ ঘোষ এখন 'ছবিকল্প' ব্যবহার করেন। ক্যাথারসিসের বাংলা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত করেছেন 'পরমা নিবৃত্তি'। এই প্রবন্ধরচনায় রঞ্জিতবাবু যে বিরল যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সে দিকে তাকিয়েই মনে হয় এ-সম্পর্কিত কোষ গ্রন্থটির দায়িত্বও নিতে পারেন তিনিই।

সুবীর রায়চৌধুরী-র 'কবিতার সাময়িকী ও আধুনিকতা' সাময়িকপত্রে কবিতা প্রকাশের সূচনা 'কবিতা' পত্রিকার মাধ্যমে কীভাবে মর্যাদা সম্পন্ন হলো সেটিই প্রধান বক্তব্য হিশেবে স্থাপন ক'রে পরবর্তী পত্রিকাগুলির কিছু পরিচিতি দিয়েছেন। প্রবন্ধটি আরও বিশদ হবে, এমন প্রত্যাশা, যে-কালে লেখক সুবীর রায়চৌধুরী, সংগত ভাবেই কাঙ্ক্ষিত। অরুণ কুমার ঘোষ তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতা : অনুবাদ চর্চা'য় অনুবাদক কবিদের প্রাধান্য দিয়েছেন, বিশেষত বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এঁদের অনুবাদ বিশিষ্টতার দিকগুলিকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করেছেন। সম্প্রতিকালের অনুবাদ, বিশেষত তরুণ কবিদের কলমে, সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে সহমত। তবে মূলের সঙ্গে অনূদিত কবিতা মিলিয়ে দেখার দায় বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে (এলিঅট বলেই হয়তো) যত বিশ্বস্ত ভাবে পালন করতে চেয়েছেন, অন্যদের ক্ষেত্রে পরিচয় যা বিজ্ঞপ্তি প্রদানটুকুকেই লক্ষ্যে রেখেছেন। সুনীল-কুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কাব্য পাঠকদের প্রতিক্রিয়াকে ঘিরে। তিনি গণমাধ্যমগুলিকে কাব্যসম্ভোগের শত্রু ব'লে মনে করেছেন, যাদের প্রতিক্রিয়ায় কবিতার দেখা দিল স্বগত-জটিল স্বরায়ন। প্রকৃতপক্ষে এ-রকমটা যোরোপে যেমন ও যতটা ঘটেছে, এ দেশে বোধহয় তেমনটা ঘটেনি। এখানকার সংকট, যদি সংকট বলি, তবে সেই এলিটিসিজম্ যা থেকে প্রত্যাবর্তনের জৈবিক আততিকে কবিতায় সঞ্চারিত করবার তাড়া অনুভব করেন অনুজ কবিদল।

গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ নচিকেতা ভরদ্বাজের নির্বাচিত পঞ্জী (কবিতা সংকলন, আলোচনা, কবি-বিষয়ক আলোচনা, কবিতা পত্র) থেকেও পাঠকের প্রতি-

ক্রিয়ার ধারাবাহিকতার আদলটিকে গ'ড়ে তোলা যায়।

অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা।' এটিতে কাব্যনাট্যের আঙ্গিক-সম্পর্কিত আলোচনা যতটা, আধুনিক বাঙলা কাব্যনাট্য সম্পর্কে উল্লেখ ততটাই কম। য়েটস বা এলিঅটের কাব্যনাট্য প্রসঙ্গের উল্লেখ উদাহরণ থেকেই অশ্রুকুমার আহরণ করেছেন তাঁর ভাবনা।

আধুনিকতা-র রূপকল্প যে বিশেষ উপাদানটিতে আশ্রিত, সেটি নিশ্চয়ই শব্দ, শব্দের একান্তমূল্য। আধুনিক কবিরা শব্দকে কীভাবে 'স্বয়ং স্বতন্ত্র মর্যাদা' দিয়েছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সেটি তাঁর 'শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ' আলোচনার প্রথমাংশে দেখিয়েছেন। কামিংস যখন কবিতা-কে ছিরালাপের মতো নিকট-গোপন বলতে চান, অথবা ভালেরি যে 'word sceptic' হয়ে ওঠেন সে তো কবিতাকে মেধাজাগর করার তাগিদে যেখানে বিশ্ব-পুরাণ আত্মতার সঙ্গে মিলে একটি ব্যক্তিক আত্মীয়বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করবে, যেখানে কবির দরকার মুখচ্ছদ, পাঠকের একান্তঠাহর সেখান থেকেই অন্তর্গত দ্বন্দ্বরক্তিম সত্তাটিকে আবিষ্কার করবে। আবেগ ও আবেগ থেকে নৈরাত্ম্যে ফিরে যাবার একান্ত আততিতে শব্দের শিথায় পুরাণের সৌজন্যে মুখচ্ছদের চকিত-বিভাবে কবিতার সেই মুহূর্তকে স্পর্শ করবেন হিমেনেথ যাকে 'state of grace' বলবেন। আর এ-ভাবেই সম্পন্ন হবে আধুনিকতার শর্ত-পালন। অলোকরঞ্জন যাকে 'মহতী অনিশ্চিতি' (আধুনিকতার সংজ্ঞা) বলেন তার গুণে তৈরী হবে সেই কবিতা যেখানে আয়ুযাপনের 'অতন্দ্রলাঞ্ছিত' মননমুদ্রা। এ-রকমই ভেবেছেন অলোকরঞ্জন তাঁর 'আধুনিকতার সজ্ঞা'য় যাকে খুঁজেছেন ঐতিহ্যে, বঙ্গসংস্কৃতির রোদনভরা শ্রীসৌষ্ঠবে, যার কাঠামো গড়েছিলেন মধুসূদন, যাকে আরও শ্রীময়ী করে তুলছে ক্লান্ত ক্লান্তিহীন কবিদের মেধাবী বেদনা।

বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার সঞ্চাররেখাটি যে এভাবে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমে স্পর্শ করলো বহুরায়তন, এ-কারণে পাঠকের সম্ভ্রম রইলো তাঁদের উদ্দেশে।

আধুনিক কবিতার ইতিহাস ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥ ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধানসরণি, কলিকাতা-৬ ॥ ৪০.০০ ॥

শ্রীমতী শুকতারা রায়

দেউলিয়া

নেহাৎ দেউলিয়া না হ'লে একখানি উইল্ ক'রে যাবো।
কৃতজ্ঞতার দলিল একটি। নইলে ঋণী থাকবো সারা জীবন
প্রথম প্রথম বিরূপ সমালোচনায়
আত্মঘাতী হ'তে চাইতো শরীর।
আজ বুঝি পরোক্ষে উপকারই পেয়েছি।
ওদের আয়নায় আমায় বাঁকা ছায়াটা অনেক
মোছা হ'য়ে গেছে।

পৃথিবীটা মোনালিসার হাসির মতো।

পোকা ও ধুলো

ম্যান্টলপীসে আরেকটি ছবি হ'লো যোগ।
ঘরের আরেক জন বিয়োগ।
অকূল সমুদ্রতীরে ছোট পোকাটির নাচ গেল থেমে।
ধুলোর স্বাক্ষর দেয়ালের কটোতে।
আবার সেই পুরনো ইতিহাস।

পোকারা ধুলোর কাছে বিনয় শিখবে কবে?

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়

আমরা আর ওরা

আমরা বল্লাম, শান্তি চাই—ওরা
ধরে নিয়ে গেল আমাদের। অবশ্য
এটাই ওদের কাজ।

আমরা বল্লাম, যুদ্ধ হ'ক তবে—ওরা
ধরে নিয়ে গেল আমাদের এবারও। অবশ্য
এখন তো ধরবেই।

শেষে, কিছুই বল্লাম না আমরা—শুধু
শান্তি বজায় রাখার জন্যে
যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলাম সবার আড়ালে

ওরা, ধরতে পারলো না আমাদের।

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

পা

১

লম্বা পা, আঙুল, একটু বাঁকানো। এইরকম ভঙ্গিকে মনে ক'রে ক'রে, মনে ক'রে ক'রে শব্দ বসাই। সাদাকালো চৌকো ছকে শব্দ রাখি, ঝ'রে যায়, একটা-দুটো। পায়ের পাতাও ছিলো টানটান, মাঝের আঙুল একটু বাঁকানো তেমন শব্দ আর নেই। সেখানে তাই শুধু মাথা রাখি, এলোচুল। আর, সাদাকালো ছকে ক্রমশ চৌকো হয়ে আসতে থাকে আমার ঘরদোর……

২

যে-রকম পদমূলে মাথা আর এলোচুল রাখবো ব'লে ভাবি, তাঁর ছায়া আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে আসে, পড়ে সমস্ত ছোটোবেলার ওপর। সিঁড়ির পাশে কচুপাতায় রক্তচন্দন, জলবিন্দু টলটল ক'রে ওঠে। আরো ঘোর-হয়ে আসা রূপকথার দিকে তাকিয়ে সেইরকম পায়ের কথা ভাবি, যার ওপর এলোচুল ছড়িয়ে পড়েছে। এরকমভাবেই তারপর বৃষ্টি এসে যায়।

ব্রত চক্রবর্তী

দু'একটা শিমুল

বুকের কাছে চাপ লাগে ;
দু'একটা শিমুল রোজ ফেটে যায়।
তুলো ওড়ে।
আমি টের পাই।

মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।
গিয়ে দাঁড়ালেই, শিমুলগুলো ফাটতে শুরু করে।

কখনও শুভেচ্ছায় ফাটে
কখনও অপমানে ফাটে
কখন অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে আসতে ফাটে
কখনও আলোর শরীর থেকে অন্ধকারের
খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ফাটে।
শিমুলগুলো ফাটে, আর তুলোর ওড়াউড়ির মাঝে দাঁড়িয়ে
আমি টের পাই : জীবনের লাভ
ফেটে-যাওয়া শিমুলের তুলো ছাড়া অন্য কিছু নয়!

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

ফসিল

প্রতি কোষে অশ্রুবিন্দু জমে আছে
কাল ভোরে ফোঁটা ফোঁটা শিশির হ'য়ে ঝরে পড়বে
আর আমার শরীর
রক্ত নয়, মাংস নয়,
প্রাচীন পাথর ; সময়ের তীরে স্থির
যন্ত্রণার পরপারে
গ্লানিহীন প্রাকৃতিক শব।

বিড়ালের মুখে শান্তি

রোদ না উঠতেই এসে বসলো বাড়ির ছাদে
নিখুঁদ সাদা একটা পায়রা।
বেশ আনন্দ হলো
মেলে দিল হৃদয়-ময়ূর পেখম
ভাবলাম
শান্তি এলো বুঝি এবার আমার ঘরে।

চোখ ফেরাতেই দেখি আর একটা নাদুস নুদুস সাদা হুলো বিড়াল
শিকারী দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে
সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে হাত তুলে বললাম : যা···যা···
চলেও গেল, বেশী দূর নয়, একটু দূরত্বে বসে রইলো বোকার মতো
ভাবলাম,
ও আর আসবে না ছিনিয়ে নিতে আমার সাদা পায়রা
প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই ঘরে গেলাম চালের খুদ কুড়ো আনতে
বিছিয়ে দেবো ছাদের উপর, খুঁটে খুঁটে খাবে।

চালের খুদ কুঁড়ো নিয়ে ফিরতেই দেখি আমার ঘর তছনছ
যার জন্য মেলেছিল হৃদয়-ময়ূর পেখম
আমার সখের সাদা পায়রাটা ছটফটাচ্ছে
ওই সাদা নাদুস নুদুস হুলো বিড়ালের মুখে।

অনার্য

গাড়ির গতির মতো গিলে নিয়ে পথ
দ্রুত পায়ে হাঁটি আমি, কখনো জন্তুর পিঠে
নামাই সমূহ ভার, সংকেত দেবার
এখন উপায় নেই, তথাগত ঘুমে

জেগে ওঠো সন্তান আমার, এই ভেবে আঁকড়াই সমুদ্রের জল
তবুও কখন যেন পানি নামে বুকের জলায়
ভয়ে হিম হয়ে আসে শরীরের ত্বক
সমাজ এখনও দূরে, আমি আলে আলে ঘুরি ফিরি

আলেয়ার মতো, রাতে লণ্ঠনের আলো—
তার গায়ে সেঁকে নিই আমার হাতের পাতা, সংসারের জানু
কখনো জড়িয়ে নিই নিন্দের কাঁথাখানি
ভারী হয়ে আসে মুখ, নুয়ে পড়ি ঘামের আভায়

আরো নীল, এখনো জানেনা কেউ অস্তিত্বের ভারে
সে আমারে করেছে গভীর
মাঝরাতে ফিরে আসি কখনো সখনো সেই শিশুটির কাছে
আমার সমাজটুকু খুলে রেখে পাশের বালিশে

বলি, তুমি আমার সন্তান
সমাজের হও বা না হও, আর পথ হাঁটতে তো পারিনা
প্রকট হয়েছে তার ক্ষিদে
ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে বিশাল পাহাড় যেন, আগ্রাসী গহন

যেখানে নেমেছে তোর হাত, সেই বুকে
এখনও রয়েছে কিছু ভয়, লজ্জা, শাসনের ভূত
আর, সবচেয়ে জুড়ে তবু যেন তোমার স্বরূপ
সেই অঙ্গীকার থেকে আমি পথ হাঁটি অসময়ে

এইভাবে এসে যদি পৌঁছলাম নিষাদের দ্বারে,
তোমার আমার মধ্যে কেন সে ছড়ালো এত হাড়
এত ব্যবধান, নাকি আমারই ভূতের ভয় তার মুখোশ পরালো
তুমি আজ হেসে আছো আকাশের নীলে আর

বেসিনেরও ফাটা দাগটিতে—
মানত করিনি তবু কেন গঙ্গাজল
ভাসালো ফুলের মতো টুকরো টুকরো তোমার শরীর
আমার জীবিত চোখে তখনো নামেনি অশ্রুদল

শুধু বুক ফেটে যায় সূর্যের তাপে,
যেদিকে তাকাই শুধু তুমি ছাড়া কিছু নেই, তবু
মাঝে আছে সংসার, মাঝে আছে মরণের কাল
এপারে নিয়তি বন্য কুমারী মাতার

মানস সরকার

বাস্তবিক

দূরে, বহুদূরে, কোথাও রাত দুটোর ঘণ্টা বাজে,
নিশুতিরাতে হুইসল্ বাজিয়ে ছুটে যায় ইঞ্জিন—
একা, অন্ধকারে ; দূরে কিংবা অনেক ভেতরে।

স্মৃতিবিস্মৃতির পরপারে একাকী মানুষ আমি জেগে উঠি অসুখীর মতো।

রাঙা নৃত্যের রাত

গর্গ্যার ছবির থেকে পোড়া আলো এনে তুলে রাখে ভাবরের রাত
এ তুমি কার মৃতদেহ কোলে তুলে নিয়ে বসে আছো বিশ্ব-চরাচরে ?

এ তোমার মুখে কোন্ নৃত্যপটি বেহুলার মুখ ভেসে ওঠে ?
এই শীতঋতু, এই বুথানি মাকড়ি পরা আম্রপালি নাচ
এরপর হিম হবে ? চারদিক বেয়ে বেয়ে নেমে আসে মেঘমন্দ্র
হিমের আলাপ। এই শব্দময় রাঙা মুদ্রার রাত
ভেঙে ভেঙে জেগে ওঠে যুগ্মবন্দী বাঁশ আর কাঠের সংশয়
এই পোরো নদী, এই দুয়ারের বন, এই স্নিগ্ধ নির্বাসিত
বনবাসী মানুষের নিঃশব্দ স্থপতি
সারারাতথানি ডানা মুড়ে পড়ে থাকে সপ্তম অশ্বের সন্ধানে।

ইন্স্‌পেকসনে বাংলো থেকে

কফির সূর্যাস্ত রঙে ভরে আছে পেয়ালার সিরামিক ও সীসা
খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসে তামার পাইরাইটিস্ গুঁড়ো গুঁড়ো
পেট্রোলম্যান এসে পারমিট দেখিয়েছে বিকেলের আগেই একবার
সন্ধ্যা হলো বলে এই নদীটিই ডুবে যাবে রিজার্ভড্ ফরেস্টে
তোয়ালে তোলাই আছে, স্নান হবে, তার আগে এদের বউকে
ডেকে বলে রাখা ভালো
সূর্যোদয়ের রঙে যদি কফি হয়, ডিমভাজা মরিচের গুঁড়ো।

সেতারের গল্প

দিয়েছ সেতার তুলে, বাজেনা সে কাজেও লাগেনা।
ভালো ছিল অন্ধকার, ছায়াপথ, যৌথখামার—
হাওয়ার ভিতরে ছিল রেণুপাত, বেণুবনও ছিল
পাপের, ভয়ের ছায়া, প্রতিবিম্বে লাবণ্যের আঁশ
পচতো অথবা পুড়ে যেতো তাপে, অক্ষমতাহেতু—
হয়তো সদর্থে আরো ভেঙে যেতো ঋতুমতী নারী!
তুমিই সহস্র ফল, আঙুলে নাচালে ফুল—প্রেমিকের মতো:
নির্জন সেতার জানে আমাদের দলবদ্ধ গান
দালালেরা বেচে দেবে আধিভৌতিক-দামে,
যে-কোনো প্রস্তাবে!

মাংস

বাতাস জলের কাছে যেতে চায়, জল
বাতাসের কাছে ছিলো; কিন্তু করতল
আলোছায়া ধ'রে থাকে কিছুক্ষণ, আর তারপরে
দ্বিধাবিভক্তির টানে খুলে যায় কল—

আরো যাও, যেতে হবে, অন্য কোনো দুয়ারের কাছে···

নরম মাংসের তীব্র প্ররোচনা আছে!

ব্যক্তিগত ছবি : ১৯৮৫

একদা ছিলো কেউ, এখন ফাঁকা ঘর
স্বপ্নাহত ক'টা বিড়াল শুয়ে আছে;
পুরোনো আলো শুধু তোমারই আলোচনা
নতুন যা আছে সে আমারই নীরবতা!

একদা ছিলো কেউ, এখন ফাঁকা ঘর
লোহিত খাসরোধী ছায়ার টানা-জালে—
উঠেছে স্মিত ক্রাচ এবং ভাঙা স্লেট
এছাড়া কিছু নেই—ছিলো না কোনোদিনও!

সোফিওর রহমান

যদি অপারুণ

সদ্যজাত কবিতার ফুলেল লাইন
নতুন ভোরের মত শব্দ: অপারুণ প্রভাত—
যার সঙ্গে যুদ্ধে তোমার বরাবরই পরাজয়
সম্পূর্ণভাবে সে কবিতাটি তোমাকেই দিলুম সুহিতা,
জন্ম থেকেই জন্ম দিচ্ছে
মোড় ঘুরিয়ে সবাইকে ডেকে নেয় কাছে
যেখানে নিজস্ব ভূগোলে সে দ্বিতীয় পৃথিবীর মতো।
এখন এই দীঘল ঝুলন বারান্দায় আমার
শুধু তোমাকেই দেখা—

বস্তুজগতের জৌলুষে
পিতৃহারা শিশুদের নির্বাসন, পরাগ পোড়ার গন্ধ
বরফের ফ্রেমে বাঁধা ঐ রৌদ্রপুরী আকাশ।
সদ্যজাত কবিতাটি তোমাকেই দিলুম
নদীর মতো তার কোমরের বাঁক, উৎস ছেড়ে এগিয়ে চলা বহুদূর
অন্ধকার ভেঙে সে এক আলোর নগরে
আমাকে যে দিয়েছে একদিন চিরস্থায়ী পিতৃত্বের মুকুট—
সবকিছু তার তোমাকেই দিলুম
দেখতে দেখতে বিনাযুদ্ধে যেখানে আমার আজীবন পরাজয়।

শিল্প-পরিচয়

মালাবার উপকূলের এক ব্রাহ্মণ শিল্পীর কল্পনায়
কোন পৌরাণিক জন্তুর ছবি দেখে মনে হল
যে তার শরীর এলিয়ে দিয়ে উপকূলে
রোদে পড়ে থেকে ওরকম ত্রিভঙ্গ মূর্তি নেবে
সমসাময়িক জন্তুদের চেয়ে সেও অনায়াসে দূরবর্তী নভুবা পৃথক
যদিও শিল্পীর পরিচয় ছিল একালে অনন্য
ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অতি প্রকৃত প্রতিভূ।

আনুগত্য

আমি কি কারও এমন অনুগত ?
যেন কত বাধ্য ছেলে তোমার !
স্বচ্ছ হলে লজ্জাশীলা আরও
এমন তোমার লজ্জা-প্রবণতা।

তোমায় কখন স্পষ্ট ক'রে দেখি
তুমি কবে চূর্ণ করে দেবে
স্বেচ্ছাচার আবদ্ধ-শৃংখল ?
তোমাকে আমি স্পর্শ ক'রে যাব
প্রভাবিতা, স্বাধীন-মায়াময়ী
তোমায় আমি এমনভাবেই দেখি
হে বাংলাদেশের পরম মনোরমা—

আমি কি তবে তোমার অনুগত ?

'পেন্‌সেটিয়া' : আসন্ন রক্তিম

শীত কেটে ফাল্গুন ঢোকে, আর
ঝিমন্ত টেবিলল্যাম্প বাকভুল থাকে
সন্ধেরাতে—সাইকেল-রিক্‌শার হর্ণ
সংক্ষেপিত হয়ে আসে কেন ?
থির 'পেন্‌সেটিয়া' গাছ কেঁপে ওঠে :
আসন্ন রক্তিম !

থেকে-থেকে নক্ষত্র ও কাকডাকা
জাহাজডাকের বিচ্ছুরণ ;
ঈষৎ ঠাণ্ডার ঘুমে ফাট্ ধরে—
ভোরের বাতাস, তুমি কবে এতো পরিণত হলে ?

শুধু আমি একা নই, চরাচরও জেগে—
আর, টের পাই হাওয়া
ভোরের বাতাস, তুমি কবে এতো পরিণত হলে ?

সবুজ

মাটি পড়ে থেকে থেকে নোংরা হয় ; জল—পচাপাতা।

চাই দানা, পরিশ্রম, গ্রন্থ, স্বর—
অনুভূতি চাই !
এরা সব আস্তে আস্তে মাটিকে উদার ক'রে তোলে
গভীরে ছড়িয়ে যায় স্বাদুজল, বীজ
হাওয়া ও আতপ।
আর, ভোরের রোদ্দুর খুব খুশি হয়ে উঠে :
তার করতল ছোঁয় অঙ্কুরের মাথা।

আমাদের মাটি আর আমাদের বীজগুলি
ভালো হোক্, ভোলো হোক্…

সবুজ ছড়িয়ে যাক্ আকাশের মতো
আমাদের সন্তানেরা নিশ্চিন্তে দেখুক, দৃষ্টি
আমাদের থেকে স্বচ্ছ হোক !

সময়

চুপিচুপি বালি-সুরকি বয়ে আনা—ঝুলনের পথঘাট
মাটির পাহাড় ;
সিরাজ-গেরোবাজ-পর্পন নিয়ে গরম দুপুরবেলা লুটোপুটি
হাতুড়ি-পেরেক—খোপের বারান্দা তৈরি ;
হামানদিস্তায় গন্ধক-সোরা-কাঠকয়লার ছাতু, বড়ো খোল, মেজো খোল,
হাতমুখ কালি—
পনেরো দিন আগে থেকে 'কালীপুজো'র আমেজ···
একদিন ভাবতে পারি নি—ওইসব ছেড়ে-ছুড়ে বেঁচেথাকা।

ঝুলন পূর্ণিমায় একবার ঝুলন না-সাজিয়ে, শুধু চাঁদের আলোয়
হাঁটতে ভালো লাগলো
আর প্রিয়গান এলো কণ্ঠে ;
তারপর, কবে যেন তুমি—মধুরা, মনে পড়ে ?
তখন এক-একটি দিন একলা ডাকপাখির মতো—বিষণ্ণ, উদ্‌গ্রীব।

তোমার মুখ নিয়ে সন্ধ্যা আসতো
সন্ধ্যাগুলি সুখের মতন দুঃখ···
মনে হতো তোমাকে ছাড়া—মধুরা, তোমাকে ছাড়া বাঁচার
কোনো মানে নেই !

সময় যেন ধেড়ে ইঁদুর,—আমার সাধের সেই সবকিছু
সামনের দু'পায়ে তুলে ধ'রে
ছুটতে-ছুটতে চকিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, বলে,
কী হ'লো, এসো !

দর্শনীয় শরীর ১৭

আজ সকালবেলা আমি মত্তসিংহের মত লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠেছি। শীতদেশে কাঁটায় কাঁটায় ছটা বেজেছে, চারদিকে নীল পাহাড় চূড়ো উঁচু হয়ে আছে বলে নবোদিত সূর্যদেবের মুখ দেখবার উপায় নেই কিন্তু আমার হৃদয় এখনি গানের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। প্রিয় ছবির কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছি প্রভু, আমাকে অনুভব করতে দাও যে আমার মধ্যে অনন্ত প্রাণশক্তি আছে, আমি এখনি ফুরিয়ে যাব না। নারী, রঙীন কুসুমগুচ্ছ, নৌকার ইঙ্গিত এবং নীলসমুদ্র আমাকে ডাকছে। কিছুক্ষণ পরে আমি বরফগলা জলে স্নান করেছি, সাবানের ফেণাগুলোকে আস্তে আস্তে ধুয়ে ফেলেছি গা থেকে। শীতকে জয় করার উপায়ই হচ্ছে একটু একটু করে শীতের কাছে আত্মসমর্পণ করা। উষ্ণ, ধূমায়িত একগ্লাস সরযুক্ত দামী দুধ পান করেছি। অতঃপর জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছি দূর পাহাড়মালার গাছপালা স্বচ্ছ দৃশ্যাবলীর উপর চোখ রেখে। পর পর তিনদিন বৃষ্টির পর আজ প্রথম রোদ উঠল। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমার খুব ভালো লাগছে। বস্তুত প্রতিদিনই আমি শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভালো এবং আরো ভালোর দিকে এগোচ্ছি। গতকাল লাল পশম-পরা একটি বালিকা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং ফেরবার সময় আমার আগে আগে চলেছিল তিনটি সুগঠনা বালিকা। তার মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দরী ও মনোজ্ঞা তাকে আমি 'পূর্বসুখের স্মৃতি' এই নাম দিয়েছি। কাল সারারাত আমি ঘুমের মধ্যে অঙ্কিড ফুলবিষয়ক চিন্তা করেছি। লাল, হলুদ, নালাভ ও শাদা পাপড়ি বিশিষ্ট এই ফুলগুলি পুঞ্জ পুঞ্জ রূপসী ঢেউ তুলে বনস্থলীর কোলে কোলে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যরাতে কাঁচের দরজার ভিতর দিয়ে টেরেসের উপর হালকা নারী-আলিঙ্গনের মত পড়ে থাকা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে আমার সেই হারিয়ে যাওয়া অঙ্কিড ফুলগাছটির কথা আবার মনে পড়ল। একদা দিনরাত সে আমার চোখের সামনে ছিল। আমার মধুর নারী ! সিন্ধুতীরের কুঞ্জবনে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছো, কথা দিলাম শীঘ্রই তোমার কাছে আসবো। অপূর্ব সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় শহর ; জ্ঞান, ফুল ও বিলাসিতার উৎসভূমি, বাতাসে সুগন্ধ বীজ ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের উপর ছোট্ট ঘর, আমি মাঝরাতে জেগে ছাদে এসে দেখি, চাঁদ সমুদ্রের

বুকের উপর জেগে উঠছে। শূন্য সমুদ্র, বাতাসের পরিত্যক্ত বেদনা আর আফ্রোদিতার মত সুগোল চিত্রময়ী চাঁদ। মনে মনে জিজ্ঞাসা করলাম সৌন্দর্যের অধীশ্বরকে : প্রভু এখানে আমি কি দ্বিতীয়বার নূতন করে জন্মগ্রহণ করব না ?

শ্যামলকান্তি মজুমদার

সুখ, তুমি নির্বাসনে যাও

সুখ, তুমি নির্বাসনে যাও
একটি দিনের জন্য দূরে সরে থাকো।

চেয়ারে বসাব আমি বরং দুঃখকে
গল্প করব তার সাথে
দিনের সমস্ত কথা শুনিয়ে শুনিয়ে
নিঃস্ব হব খুব।

তারপর বিছানায় বলব ঘুমোতে
গাঢ় নিদ্রা, নিশি ঘনঘোর।

এরপর আমি যাব স্নান সেরে নিতে
রাত্তিরের বিপন্ন আঁধারে

আমার জন্য তুমি অপেক্ষা ক'রো না।

সুখ, তুমি নির্বাসনে যাও
একটি দিনের জন্য দূরে সরে থাকো।

ডুব

দেখেছি
কালো জলের পুকুর
পুকুর পাড়ে নামানো লণ্ঠন

এ লণ্ঠন কার
কতদিন জ্বলবে

জল ছাড়া আর কিছু পুকুরে থাকেনা
সহবাসী ঘাস বলেছিল
বলেছিল : অন্য সব বর্জনীয়
জল ছাড়া অন্য কেউ শ্লীলতা জানে না

তবু পুকুর পাড় লণ্ঠন জ্বেলেছে
ও কাকে দেখাতে চায় নাল জলে
নাকি আমাকেই ?
আমার হাতে লণ্ঠন
আমি লণ্ঠন নামিয়ে একদিন
নেমে গেছি পুকুরের নীলে

সহবাসী ঘাস জেনেছিল
সেই ব্যথা

মণীন্দ্র গুপ্ত

শব্দজালং মহারণ্যং···

১

টুলো পণ্ডিতের হাসি : সকৌতুক অষ্টাদশ শতকের নিদাঘবাতাসে
স্বর্ণচাঁপা—সময়লাঞ্ছিত হয়ে বিনামূল্য ফোয়ারার জল
বন্ধ্যাগমনের পথে মরে গেছে।
তবুও বাতাসে সেই তর্ক শুনি। মীমাংসা হয় না।
মেঘে গুরুগুরু আকাশে উদ্ভট শ্লোক বাজে—

কবিতার অনাসক্ত রস পলাশ বা আমমঞ্জরির সঙ্গে
উপভোগ-আলোচনা করা আজও শ্রেয়।

২

শালভঞ্জিকার মূর্তি গাঁথা আছে মনে।
দুপুরের গ্রীষ্মের বাতাস দূর আগ্নেয় গিরির ছাই
উড়িয়ে আনছে বনে।
কুণ্ডে জল খেতে এসে বাঘিনী সহসা কিছু পেয়ে
মাতৃষনারীর মতো লাবণ্যমন্থর হয়ে ফিরে গেল।
তাপ ছায়া স্বেদ ও বাতাস ঘন করে আনে মরীচিকা :
শালভঞ্জিকার মূর্তি।
অদ্বয়ের মুখ চেয়ে দিন গেছে।
চৈত্রে তার সুগঠিত রসালো হাসির কথা মনে করে
আরও দিন যাবে।

৩

তুমি স্নান করতে নেমেছ সাগরে
জলবরুণের কামুক মুখ উঁকি দিচ্ছে তোমার আশেপাশে
উচিত-অনুচিতের দেশ শেষ হয়েছে সাগরতীরে এসে
এখন শুধু জল
এই দুপুরে রোদের উপর লাফিয়ে উঠছে জল
নোনা হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন ছুটে আসছে শিশুমারের গলার স্বর
টুকরো গানের মতো

আমি এখন যাই—
ছত্রপলাশ চৈত্যে এবার বসন্ত কাটাব অর্হতের কাছে।

৪

সংস্কার পেরিয়ে প্রেত যেতে যেতে আকর্ণবিস্তৃত চেয়ে থাকে :
তীব্র রশ্মি আনন্দে চাখছে তার পোড়ামাংস,
দলবদ্ধক্ষুধার্ত আগুন হলদেরোম ভিঙ্গো কুকুরের মতো হুমড়ি খেয়ে
অতি দ্রুত খেয়ে ফেলছে তাকে।
আগুনকে হরিধ্বনি আক্রমণ করে—
চোখের গর্ত থেকে লকলক ওঠে জ্ঞানশিখা—

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউ আসবে

অপেক্ষার সময় শেষ হয়ে আসছে
আজ কেউ এলো না

জটিল সময় কাঁপে ইথার তরঙ্গে
আমি ছুটে যাই নাম ধরে ডাকি

রোজই কেউ আসে
অফিসের বন্ধু পরিজন, পাড়ার অচেনা সঙ্গী
দাদা বৌদি আসে তুতুন আসে খলবলিয়ে
বই আনে ছবি আনে কবিতা আনে
আমাকে নতুন সময়ের স্বপ্ন দেখায়

সময় শেষ হয়ে আসছে কেউ এলো না···

আনুপূর্বিক

অনেক কথা বলা হোল সারাসন্ধ্যেবেলা,
অনেক গান হোল সারাসন্ধ্যেবেলা,
তারপর থর নিস্তব্ধতা।

আপেলের গায়ে হাল্‌কা রক্তের ছোপ।

নিশুতি অল্প দূরে, স্ত্রীর পাশ থেকে উঠে
দুঃস্বপ্নতাড়িত মানুষ চেয়ে আছে
জানলার বাইরের উজ্জ্বল বেনারসীর দিকে।

বালিশের আলরে কতদিনের পুরনো চোখের জল!

শান্ত শীতের রাত বয়ে চলে
আরো শান্ত এক ভোরের দিকে।

অনেক কথা বলা হোল সারাসন্ধ্যেবেলা,
অনেক গান, তারপর অমোঘ নিস্তব্ধতা।

অনেক কথা, অনেক গান বাকী রয়ে গেলো।

শোক

তীব্র ভালোবাসা তাকে ডেকে নিয়ে গেছে আগুনের কাছে, আর
সারাজীবনের যত ক্ষয়া-পূর্বটে অপরাশি সব ঝ'রে পড়ে আছে
তার এলানো শরীরের নিঃশব্দ চারপাশে।

এক মিনিটের শোক শেষ হ'লে মহমানুষের দাণিজ্য শুরু হয় ফের,
শুধু ক'টা একান্ত মানুষ মাঝে মাঝে চমকে ওঠে স্পর্শের স্মৃতিতে, হাহাকারে।

পুরনো দিনের বন্ধু

অবনীশ, আমায় চিনতে পারবে কি? আমি কল্যাণ।
কাল অনেক বছর পর তোমায় দেখলুম ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস জানলায়,
খুব অবাক লাগলো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি,
তালি মারা জামা, চোখের নীচে কালো গর্ত।
জামে আটকে ছিলো ট্রাম, আমি দূর থেকে তোমায় দেখছিলুম,
কাছে যেতে সাহস হয়নি, যদি টাকা চাও বা অন্য কিছু।
তোমার দিকে বারবার তাকিয়েও কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না
তুমিই সেই সেদিনের বকমকে, স্মার্ট অবনীশ।
কষ্ট হচ্ছিলো খুব। অবু কষ্টই না, একটু নিষ্ঠুরতার ঝলকও ছিলো তাতে,
মনে পড়ছিলো একবার তুমি আমার নতুন বই ছিঁড়ে দিয়েছিলে,
আর একবার স্মার্ট অবনীশ আরো স্মার্ট হবার জন্যে
আমার চুলে আটকে দিয়েছিলো একদলা পীচ।
আমাকে ক্ষ্যাপা হ'তে হয়েছিলো সেবার, মনে পড়ে?
আমি আজো ভুলতে পারি নি সে-সব কথা।
মানুষ তো অপমান ভোলে না।

অবনীশ, কাল তোমায় আমি ধরা দিই নি। আর, তখন থেকেই
আমার মনে হচ্ছে রাস্তাঘাটে হয়ত আমাকেও কেউ কেউ
ঠিক এমনিভাবেই এড়িয়ে যায়,
হয়ত সেই নিষ্ঠুর যার পিলিতি পেন্সিল আমি কেড়ে নিয়েছিলুম,
বা হয়ত সেই মিহির যার দিদির নামে একটা খারাপ কথা
বলেছিলুম বলে সে ক্লাশে ভীষণ কান্নাকাটি করেছিলো।
তারাও নিশ্চয়ই তাদের অপমানের কথা ভোলে নি।

অবনীশ, কাল থেকে কেবলই মনে হচ্ছে আমার,
বাকী জীবন আমাকে হেঁটে যেতে হবে খুব ভয়ে ভয়ে,
মাটির দিকে চোখ রেখে।
কেননা চোখ তুললেই হয়ত দেখবো এমন কেউ
যে আমার চোখ থেকে সরিয়ে নেবে চোখ,
বা এমন কেউ যার চোখ থেকে আমাকেই চোখ সরিয়ে নিতে হবে।

অন্য নারী

মাখন মাখানো পাথুরে হাসির
কঙ্কাল ছড়ানো ছিল নষ্ট চাঁদ ঘিরে
তুকতাক ছিল, ছিল ডাইনী রাতের মোহ,
কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ঝড় এনেছিল,
থেঁৎলানো জগৎ প'ড়ে আছে
আমার দিবস ঘিরে আজ।

ফুলদানি ছিল সাজানো সুন্দর ড্রয়িংরুমে
প্রিয়তম হৃৎপিণ্ড দুলেছিল
নেহাৎ অদরকারি শোভা হ'য়ে।

পোড়া সিগারেট, শুকনো কালো ফুল,
কিছু পাতা, ছেঁড়া মানিপ্ল্যান্ট
নিশ্চুম নিটোল হাতে একদিন
ছুঁড়ে দেবে গরাদ গলিয়ে
তাই ক্লান্ত প্রতীক্ষায় জানালার ধারে
উদ্বিগ্ন মমতা নিয়ে রাত কাটে।

শেষ রাতে লোভী কুক্কুরীর দল
আবর্জনা ঘেঁটে তুলে আনে এঁটো মাংস।

বীজ

নাটকের চরিত্র

ডক্টর ভবভূতি চৌধুরী (মাঝবয়সী অধ্যাপক)
ইন্দ্রাণী চৌধুরী (ভবভূতির স্ত্রী)
ডক্টর অমিয় সান্যাল (স্থানীয় ডাক্তার)
শ্যামল মজুমদার (এঞ্জিনিয়র)

প্রথম দৃশ্য

নভেম্বর। শীতের বিকেল
স্থান-সিউড়ি

(মঞ্চে ইন্দ্রাণী দুহাতে মুখ ঢেকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। বাঁ পাশ থেকে তার মাঝবয়সী স্বামী ভবভূতি প্রবেশ করলেন।
নেপথ্য থেকে ভাদু গান ভেসে আসছে :

ক্যানেলের জল পেলে যারা
তাদেরই চ্যা-ষ হলো সারা—
মেঘের জল হয়েছে হারা
গেলো ধানের বীজন মারা।)

ভবভূতি—কলুকে পুড়িয়ে এলাম এইমাত্র তিলপাড়ার শ্মশানে, ময়ূরাক্ষীর ধারে,
কলু, আমাদের কলু, ভাবতে পারো আমাদের দশ বছরের সন্তান,
যাকে আমরা তিলে তিলে বড়ো ক'রে ভেবেছি যে
একদিন মেয়ের মতো মেয়ে হবে। সে কিনা, এমনভাবে
তিনদিনের কলেরায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলো আমাদের।
ডাক্তারও কিছুই করতে পারলো না; বললো ঠিকমতো ইঞ্জেকসন
পড়েনি শরীরে।
আমি তার কথা অবিশ্বাস করিনি, ইন্দ্রাণী,
অমিয় সান্যাল আমাদের অনেকদিনের বন্ধু, তাছাড়া এখানে তার

হাতযশ আছে, সে তো সবাই বিলক্ষণ জানি,
তবু কেন, কেন, কেন……

ইন্দ্রাণী— আমি আর পারছি না, ভব,
সব কী রকম যেন শূন্য, ঠেকছে, সব অন্ধকার, সব কালো
তুমি যেই গেলে, পাড়ার কয়েকজন এলো সান্ত্বনা দিতে
তারা চ'লে যেতে, সমস্ত শরীরটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো
বাজ-পড়া গাছের মতন—
আমি পুরনো অ্যালবাম খুলে দেখছিলাম একে একে
কলুর ছোটোবেলা থেকে বড়ো হ'য়ে ওঠবার
সব রকমের ছবি—কোনোটাতে হাসছে, কোনোটাতে
বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক ক'রতে গেছে, কোনোটাতে
প্রাইজ নিচ্ছে স্কুলে।
আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, তুমি আগে ক'রতে,
এখন ক'রো কিনা নিজেও জানো না,
কাকে দোষ দেবো, তবে, আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া—
বলো, কাকে দোষ দেবো ?

ভবভূতি—শীতে শুকনো ময়ূরাক্ষীর ঘোলা জল,
আর দু'একটা শকুন এখানে ওখানে ব'সে আছে,
কাঠের গুঁড়ির ওপর ভেসে আসছে কী যে একটা, বুঝতে পারিনি,
দু'তিনটে কুকুর ডাকছে, ডোমগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনের হল্‌কা যেন
আরো লাল ক'রে তুলছিলো।
কলু, কলু, শোন্, আমি একবার ডাকলাম, ও উত্তর দিলো না।
সারাটা রাস্তা আমি টলতে টলতে ফিরে এলাম।
শ্যামল সঙ্গে ছিলো, সে কিছুক্ষণ পরে আসবে বলেছে।
ডাক্তারও আসবে, আরো হয়তো কেউ কেউ আসবে যাদের চিনি না।
কিন্তু কল্যাণী চৌধুরী আর কোনোদিন আসবে না এই বাড়ির ভেতরে।

ইন্দ্রাণী—যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো, এক কাপ চা নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

ভবভূতি—হাত পা ধোবার ইচ্ছে এখন আর নেই, তাছাড়া ময়ূরাক্ষীর জলে
আমি সমস্ত শরীর প্রায় বারবার ধুয়ে এসে
তবেই উঠেছি।

সন্তানের জন্ম দেয়া তবে কি অন্যায়, কোনো ঘোরতর পাপ,
বিশেষত যে সন্তান অকালে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে ?
কিন্তু আমরা কি করে জানবো, কে আগে শ্মশানে পুড়বে—
সন্তান, না তার পিতামাতা ?
বলো জানবো কি ক'রে ? নাকি জানা যায় ?
যারা জ্যোতিষীতে বিশ্বাস করে, তারা বলে
সব আগে থেকে জানা যায়।
আর জানলেই বা কী হ'তো ?
(কড়া নাড়ার শব্দ)
আসুন, আসুন, বাইরের দরজা খোলা আছে।

(একই সঙ্গে এঞ্জিনিয়র শ্যামল মজুমদার এবং ডাক্তার অমিয় সান্যালের প্রবেশ)

অমিয়—সিউড়িতে সোরগোল পড়ে গেছে যে, আমি ডাক্তার হ'য়েও
তোমার মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম না, ভবভূতি।
কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই, বিশ্বাস করো।
আমি চেষ্টা করেছিলাম কলুকে বাঁচাতে—
কলকাতা হ'লে হয়তো বাঁচাতে পারতাম। ইঞ্জেকশন,
হয়তো খারাপ ছিলো, তাছাড়া আমি আমেদপুরে গেছিলাম ব'লে
ওষুধপত্র দিতে দেরি হ'লো।
তুমি শক্ত হও, ভবভূতি, তুমি শক্ত হও।

শ্যামল—ইন্দ্রাণী কোথায়, ওর জন্যে সত্যিই মায়া হয়।
তুমি পুরুষ মানুষ, ভবভূতি, তুমি হয়তো সামলে উঠবে কন্যাশোক—
কিন্তু আমি জানি, বাছুর না থাকলে খড়ের বাছুরতৈরি ক'রে
গাভিনীর সামনে রাখতে হয়, নইলে তার বোঁটা থেকে পীযূষ ঝরে
না। তাছাড়া, কল্যাণী সবে বেড়ে উঠছিলো, যেন লকলকে আমনের
ধান, তাকে কে কাস্তে দিয়ে উপ্‌ড়ে নিলো ? আমরা বন্ধুরা
দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু ক'রতে পারলাম না।
কীই বা কর'বো ভবভূতি !

(নেপথ্য থেকে আবার গানের শব্দ :
ক্যানেলের জল পেলে যারা
তাদেরই চ্যা-ষ হ'লো সারা—

মেঘের জল হয়েছে হারা
গেলো ধানের বীজন মারা।

ইন্দ্রাণীর চায়ের কাপ হাতে প্রবেশ।)

ইন্দ্রাণী— ও তোমরা কখন এলে, ডাক্তার, শ্যামল। তোমরা
চা-টা কিছু খাবে তো, আমি নিয়ে আসছি এখুনি।
আমি ভীষণ, ভীষণ শক্ত হ'য়ে গেছি, অমিয়, শ্যামল।
মনে হচ্ছে, আমি পাথরের তৈরি কোনো স্ফিংস,
কিংবা তা-ও নয়, শুধু পাথরের তৈরি কোনো কঠিন পাষান
আমি একটুও কাঁদছি না, বিশ্বাস করো,
আমি একফোঁটা জল ফেলছি না চোখ থেকে।

শ্যামল আর অমিয় দুটি চেয়ারে বস'তে ব'সতে, একই সঙ্গে ব'লে উঠলো :
(প্রথম লাইনটি বললো শ্যামল, দ্বিতীয়টি অমিয়)
ইন্দ্রাণী, আমরা তোমাদের বন্ধু, ইন্দ্রাণী।
আমরা অনেক দিনের বন্ধু তোমাদের।

ইন্দ্রাণী (হঠাৎ চিৎকার ক'রে)—কলু, কলু, কলু, কলু!
আমি আর পারছি না রে, তুই ফিরে আর।

ভবভূতি—আস্তে, ইন্দ্রাণী, আমি কী যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।
বিদেশীপাড়ার দিক থেকে এসে কলেজের
দিকে এগিয়ে চলেছে।
যেন বাবলা গাছের হাজার হাজার পাতা
ঝড়ের মতন শব্দ ক'রে হাওয়ায় হাওয়ায়
ভেসে আসছে। কয়েকটা হলুদ ফুল
মাটির ওপরে প'ড়ে আছে, তারাও কি শব্দ ক'রে উঠছে ওখানে ?
আস্তে, ইন্দ্রাণী আস্তে, আমাকে সমস্ত কিছু শুনে নিতে দাও।

অমিয়— তুমি কিছুদিন দু'একটা ট্র্যাংকুলাইজার খাও, আমি প্রেসক্রিপশন
লিখে দিচ্ছি। নইলে রাত্রে তোমার ঘুম না-ও আসতে পারে।
ইন্দ্রাণী, তুমি তো একদিন বলেছিলে ট্র্যাংকুলাইজার খেলে
পরের দিন সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে।
তোমাকে কী ওষুধ দেবো, আমি বুঝতে পারছি না।

ইন্দ্রাণী—বিষ-ও তো একরকম ওষুধ, তাই না, ডাক্তার।
কতো রকমের বিষ আছে পৃথিবীতে, ভেবে ছাখো
কোনো কোনো বিষে মানুষের মৃত্যু হয়, আবার
এমনও তো বিষ আছে, যা তোমাদের ওষুধপত্রে খুব
কাজে লাগে।

শ্যামল—আমি বুঝতে পারছি ইন্দ্রাণী, তোমার কী হয়েছে,
আমি ঠিক বুঝতে পারছি। তুমি থামো।

ইন্দ্রাণী—ডাক্তার, ডাক্তার, তুমি এই এঞ্জিনিয়র সাহেবের কথা
কানেও দিয়ো না।
বিষ, বিষ দাও, আমাকে তুমি এইমাত্র বিষ এনে দাও
আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতাম, একটা সাপ
তাড়া ক'রে আসছে পুকুর-পাড়ের জমি থেকে।
কী সুন্দর, চিক্কণ শরীর, লাল-হলুদের-ছিট-দেয়া, আমি যেই পেয়ারা
পাড়তে গেছি, সে হঠাৎ ফণা তুলে,
সে হঠাৎ ফণা তুলে, সে হঠাৎ ফণা তুলে…
তার পরে কী, আমি মনে করতে পারছি না।

ভবভূতি—ইন্দ্রাণী, পাগলামি ক'রো না, চুপ করো।
তারপর কী, আমি জানি। সে তোমাকে স্বপ্নেও
ছোবল দেয় নি, শুধু তার শরীরের
চকিত বিদ্যুচ্চমক ঝিলকিয়ে স'রে গিয়েছিলো।

শ্যামল—হয়তো কলুও এরকম স্বপ্ন দেখতো।
ডাক্তার, তুমি তো জানো ফ্রয়েড কী বলেছেন স্বপ্ন বিষয়ে।
বিশেষত, সাপের স্বপ্ন যারা দেখে তাদের বিষয়ে।

ইন্দ্রাণী—পাকামি ক'রো না, এঞ্জিনিয়র,
শুধু ডাক্তার কেন, ভবভূতি, আমি তুমি
সবাই ফ্রয়েড পড়েছি। সেটা বড়ো কথা নয়।
কিন্তু আমি কিছুতেই, কিছুতেই মনে করতে পারছি না
স্বপ্নটা কিভাবে শেষ হ'লো ··

ভবভূতি—ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, ইন্দ্রাণী, তুমি আর…

ইন্দ্রাণী—বিষ, বিষ এনে দাও, অমিয়, আমাকে তুমি বিষ এনে দাও।
নীল নক্ষত্রের মতো বিষ, কিংবা খুব লাল, রক্ত চুনির মতন।
আমি খুব সুন্দর জিনিস পছন্দ করি, তোমরা তো জানো।
যেমন তেমন বিষ আমি খেতেই পারবো না, বমি করে দেবো।
কিন্তু যদি সুন্দর, খুব সুন্দর কোনো বিষ হয়, সুন্দর বিষ।

অমিয়—রাবিশ। বিষ বিষ করছো কেন, ইন্দ্রাণী।
তোমরা দুজনে তো বেঁচে আছো ভবভূতি, তুমি।
একটি সন্তান গেছে, আরেকটি সন্তানের জন্ম দিতে পারো।
এমনকি বয়স তোমার?

শ্যামল—ডাক্তার তো ঠিকই বলছে, এমনকি বয়স তোমাদের।
দুঃখ তো পাবেই, সন্তানশোকের দুঃখ কে না পায়, বলো,
কিন্তু যদি আরেকটি ছোট্ট ছেলে কিংবা ছোট্ট মেয়ে
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকে মেঝের ওপরে,
টিপয় উল্‌টে দেয়, অ্যাশট্রের ছাই দেয় ছড়িয়ে টেবিলে,
তাহলে আবারো হয়তো ভালো লাগবে তোমাদের।
বিশেষত তোমার, ইন্দ্রাণী।
তুমি আড্ডা দেবার ফাঁকে ফাঁকে পশমের জামা বুনবে,
কখনো বা কোলে নেবে ছোটোটিকে,
তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভবভূতি—ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, ইন্দ্রাণী, শ্যামল, অমিয়,
ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।
শুধু আজকের ধকল বা যন্ত্রণার জন্যে নয়,
কিছুদিন ধ'রেই এক অবসাদ ঘিরে থাকছে
আমার শরীর।
যেন কচুরিপানায়-ঢাকা এক ডোবার ভেতরে
আমি আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছি, চারপাশে কাদা, ফেনাজল
দুহাত ওপরে তুলে আমি বলতে চাইছি "বেঁচে আছি",
কিন্তু কখন যেন পা হড়কে গেছে—
আমি আর ঠিক উঠতে পারছি না,

আমার ইন্দ্রিয়···যাক, বড়ো ক্লান্তি, বড়ো শোক।

অমিয়—তুমি একটা ট্র্যাংকুলাইজার খাও, ভবভূতি।
নোট বই লিখে লিখে তুমি অনেক পরিশ্রম করেছো
গত তিনবছর। উপার্জন অনেক করেছো,যাতে কলেজে পড়াতে আর
না হয়।
তারপর আজকের এই দুর্ঘটনা! তোমার স্নায়ু কি আর ঠিক থাকতে
পারে!

শ্যামল—শুধু ভবভূতির কথা কেন ভাবছো, ডাক্তার,
স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই তুমি একটা কিছু ওষুধ-পথ্য দিয়ে যাও
আজ রাত্রে ওরা যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে।

ইন্দ্রাণী—বারে! কে এখন ট্র্যাংকুলাইজার খেতে যাবে!
আমি আজ জেগে থাকবো, জেগে থাকবো, সারা রাত জেগে
দেখবো আমার বুকের ভেতরটা আজও দপ্‌দপ্‌ করে ওঠে কিনা।
আজ তো জ্যোছ্‌না, তাই না? জ্যোছ্‌না খুব ভালো—
কী, তোমরা অমন বোকার মতো তাকিয়ে তাকিয়ে
কী ভাবছো, বলো তো!
ভাবছো, আমি আবোলতাবোল বকছি, ভাবছো, আমি
হয়তো পাগল হয়ে গেছি।

ভবভূতি—না, তুমি পাগল হওনি। কিন্তু তুমি ক্লান্ত হওনি
কেন, বুঝতে পারছি না।
লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ব্র্যাণ্ডি খেয়েছো কিনা, আমাকে বলোতো!
যদি থাকে, আমাকে একটু দাও, প্লিজ, একটু দাও।

অমিয়—না, না, খবর্দার নয়। ট্র্যাংকুলাইজারের সঙ্গে
মদ clash করবে। কখনো ছুঁয়ো না।

ইন্দ্রাণী—না, না, না, আমি কিছু ছোঁবো না।
কাকে ছোঁবো, বলো, কাকে ছোঁবো?
বরং ছোবল দেবো, তোমরা সাবধান। দূরে থেকো।
যাও, চলে যাও, এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে যাও।
যদি পারো, ডক্টর ভবভূতি চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে

তোমাদের তাসের আড্ডায় গিয়ে ব'সো।

ভবভূতি—আমি কোথাও যাব না, ইন্দ্রাণী। আমি বড়ো ক্লান্ত। শুতে চলো।

অমিয় এবং শ্যামল—আমরা চল্লাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফেব্রুয়ারি

ইন্দ্রাণী—প্রায় চারমাস হ'য়ে গেলো, কলু আমাদের ছেড়ে গেছে।
আমি তো আরেকটি সন্তান চাই, ডাক্তারও তো
তাই বারবার বলছে, তবু তুমি কোনো কিছু কানে তুলছো না।
এমনকি আমার সঙ্গে শোও না পর্যন্ত আজকাল।
শ্যামল, আর ডাক্তার আসছে যাচ্ছে, আমাদের সত্যি বন্ধু ওরা,
আচ্ছা, মামা-ভাগ্নে পাহাড়ে উঠে তুমি প্রায় পা হড়্‌কে
পড়ে যাচ্ছিলে, তাই না?
কী, এতো গম্ভীর কেন? একটুও যে হাসো না আজকাল!

ভবভূতি—আমি বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছি, ইন্দ্রাণী, আমি ক্রমশই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।
শরীরে তেমন আর জোর পাই না, ডাক্তারকে সমস্ত খুলে বলেছি।
সে আমার চিকিৎসা করছে, অনেকরকম ওষুধ, ইন্‌জেকশন দিয়ে
আমার যৌবনকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না।
শুধু অমিয় সান্যাল কেন, আমি কলকাতায় গিয়েও
অনেক স্পেশালিষ্ট দেখিয়েছি, তাঁরাও ওষুধ দিয়েছেন,
কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

ইন্দ্রাণী—কী যা-তা বকছো, তুমি এ-বয়সে বুড়ো হবে কেন?
আজ রাত্রে আমরা আবার প্রেম কর'বো, কেমন,
যেরকম আগে করতাম।
আমি একটু রোগা হয়ে গেছি, তাই নয়,
আমাকে তোমার আর ভালো লাগছে না!
রোজ আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু একটু
ক'রে দেখি
যোগ-ব্যায়াম ক'রবার কিছু পরে, স্নান সেরে এসে

তোয়ালে জড়িয়ে, আমি নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করি।
একটু রোগা হ'য়ে গেছি হয়তো, কিন্তু আমার শরীর, মন
খুব তাজা আছে।
বলো তো, স্কিপিং ক'রে দেখাতে পারি তোমার সামনেই
জানো, নিজেকে কখনো কখনো একটা নুয়ে-পড়া
বেতস গাছের মতো মনে হয়, যেন জলের ওপরে ঝুঁকে আছি।
তুমি সেই জল, অথচ তোমার নাগাল আমি আজকাল
পাচ্ছি না, ভবভূতি।

ভবভূতি—হয়তো ছিলাম জল একদিন, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,
হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে উঠে টল্‌টল ক'রে উঠতাম কখনো,
কিন্তু এখন আমি শুকনো ডোবার মতো পড়ে আছি,
তুমি বিশ্বাস করো, আমার যৌবন আর নেই,
আমি আর সন্তানের পিতা হ'তে পারবো না।

ইন্দ্রাণী—না, না, না, আমি আর শুনতে চাই না এসব।
আমি সন্তান চাই, যে ক'রেই হোক, আরেকটি সন্তান।
কলুর ছবির সামনে আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকি।
ওর শূন্যস্থান কোনোদিনই পূর্ণ হবে না, তবু আমি
আরেকটি ছেলে কিংবা মেয়ে চাইছি, ভব।
নইলে বন্ধ্যা মাঠের মতো ফেটে টুকরো হয়ে
আমি হয়তো ধুলোবালি হ'য়ে যাবো, কোনোদিনও
একটা ফুল-ও ফুটবে না আমার ওপরে,
একটা তৃণ-ও গজাবে না।
(বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ)
কে? কে? মনে হয় ডাক্তার বা শ্যামল এসেছে।
(ডাক্তারের প্রবেশ)

ভবভূতি—ইন্দ্রাণীকে আমি সব খুলে ব'ল্লাম, ডাক্তার।
ও কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে চাইছে না, আমি প্রায় বুড়ো হ'য়ে গেছি
তোমরা তো বন্ধুও, ওকে একটু বুঝিয়ে ব'লবে, ডাক্তার,
ইন্দ্রাণী সন্তান চায়, আমারও অনিচ্ছা নেই, কিন্তু আমি অপারগ।
ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, শোনো, ডাক্তারকে সব কিছু খুলে বলতে দাও।

অমিয় (চেয়ারে ব'সতে ব'সতে)—তোমরা তো একটা ছেলে কিংবা মেয়ে
পালন ক'রতে পারো। কলকাতায় গিয়ে···

ইন্দ্রাণী— চুপ ক'রো, আমরা adoption-এ বিশ্বাস করি না।
তাহ'লে ভব যা বলছে, সব সত্যি, ও বুড়ো হ'য়ে গেছে।
কেন, কেন, কেন, কেন, আমাকে বুঝতে দাও, আমাকে
সমস্ত কিছু বুঝে নিতে দাও।

অমিয়— আমি অনেক চেষ্টা করেছি, ইন্দ্রাণী।
আমার যা বিদ্যে ছিলো, তা তো কাজে লাগিয়েছি,
কলকাতায় গিয়ে ওকে বিশেষজ্ঞদের কাছে নিয়ে গেছি,
কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে, কিছুতেই কিছু হয় নি,
শুধু টাকার শ্রাদ্ধ হ'লো এই দু' তিনমাস ধ'রে—

ভবভূতি— টাকা কিছু গেছে, তা যাক। সেটা বড়ো কথা নয়।
কিন্তু আমি আর পিতা হ'তে পারবো না, কারো সঙ্গে
সঙ্গম কর'তে পারবো না, এই যন্ত্রণা আমাকে
কুরে কুরে খাচ্ছে, অমিয়।
তাছাড়া, কলুটা যদি বেঁচে থাকতো, তাহ'লে
বাড়িঘর অন্যরকম মনে হ'তো। আমার ব্যর্থ কাম
আমি বাৎসল্যে ভরিয়ে দিতাম!
তারপর একদিন ও আস্তে আস্তে বড়ো হ'তো
ঝলমলে গাছের মতো। আমের বউল ফুটতো,
প্রজাপতি উড়ে আসতো গাছের ওপরে।

ইন্দ্রাণী— আমি নিঃসন্তান হয়ে থাকতে পারবো না, ডাক্তার।
আমি চাই আমার রক্তের মধ্যে আস্তে আস্তে গ'ড়ে ওঠা
একটি শিশুর অবয়ব, যাকে ন'মাস কি দশ মাস গর্ভে ধরে
আমি আনবো পৃথিবীতে।
আবার আমাকে কেউ মা বল'বে আবার আমাকে ঘিরে
বেড়ে উঠবে লতার মহন কিছুদিন।

(শ্যামলের নিঃশব্দ প্রবেশ)

শ্যামল, তুমিও কি জানো, তোমাদের ডক্টর চৌধুরী

একেবারে বুড়ো হ'য়ে গেছে? আমাকে সন্তান আর দিতে পারবে না
কোনোদিন। বলো তুমি জানো?

শ্যামল—হ্যাঁ, আমি সমস্ত জানি, ইন্দ্রাণী, সব কিছু জানি।
ডাক্তার আমাকে সব খুলে বলেছে, চৌধুরীও বলেছে।
কলু চ'লে গেলো, তারপর আরেক দুর্ভাগ্য এসে ধর'লো তোমাদের।

ইন্দ্রাণী—নড়নড়ে নড়বড়ে গা
চলে যা, তোরা চলে যা,
ফুটি-ফাটা কাঠ, ফুটি-ফাটা
কখন যে হ'য়ে গেছে কাটা,
ছিলো আগে, এখন তো নেই,
পড়ে আছে খড় সামনেই,
নড়বড়ে, বড়ো নড়বড়ে···

ভবভূতি—তুমি কি ডাইনীর মন্ত্র পড়ছো, ইন্দ্রাণী?
তোমার কী হয়েছে, আমি এতদিন তোমার সঙ্গে থেকেও
আর বুঝতে পারছি না তোমাকে।
তুমি যা চাইছো, তা তো তোমাকে এখন
আমি আর দিতে পারবো না।
কিন্তু তা নিয়ে এতো দুঃখ করছো কেন, আমি বুঝতে পারিনা।
বাড়িতে বইপত্র আছে, আমি আছি, শ্যামল, অমিয়,
দুজনেই তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবু তুমি উন্মাদের মতো
সন্তান সন্তান ক'রে মরছো।

ইন্দ্রাণী—তুমি তা বুঝবে না, ডক্টর চৌধুরী।
সারাদিন পড়াশুনা নিয়ে থাকো, নোটবই লিখে বড়োলোক হয়েছো,
টাকা পয়সার কোনো চিন্তা নেই।
আর আমাকে লুকিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এলে,
প্রথমে ডাক্তার জানলো, পরে শ্যামল মজুমদার, সবশেষে আমি।
আর তারপর? শূন্য শুধু শূন্য, শুধু শূন্য, শুধু শিস দেয়া হাওয়া
বাইরের উঠোন থেকে ঘরের ভেতরে, আর ঘরের ভেতর থেকে
বাইরের বাগানে,
আসা-যাওয়া করছে।

তুমি তো অনেক শব্দ শুনতে পাও, ডক্টর চৌধুরী,
শূন্যের চিৎকার কখনো কান পেতে শুনেছো কি ?
জানো, বুকের ভেতর হিম হ'য়ে গেলেও
তবু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়।
কেন ইচ্ছে হয়, কিছু জানো ?

ভবভূতি—তুমি তার চেয়ে ইতুলক্ষ্মী, বা ষষ্ঠীর পূজো দাও।
ছাখো কিছু করতে পারো কি না,
আপাতত, আমাকে একটা বার্মিজ চুরুট খেতে দাও তো
(চুরুটে টান দিয়ে) আঃ, কী আরাম।

শ্যামল—সত্যি, ইন্দ্রাণী, তুমি বড়ো সীরিয়স কথাবার্তা বলছো
একটু সহজ হও তো, যদি বলো, আমার বাড়িতে
এক বোতল দামী হুইস্কি আছে, নিয়ে আসি।

অমিয়—শ্যামল ঠিকই বলছে, একটু ড্রিংক করা যাক
তোমাদের ঘরে ব'সে। আমার অবশ্য তিনপেগ লিমিট
তাই বা কম কি ?

ইন্দ্রাণী—অ, একটু লাইট মুডের কথাবার্তা চাও।
তা মন্দ কি, বলো তো, একটু থ্যামটা নেচে
তোমাদের entertain করি।
এককালে ভালো নাচতাম, কিন্তু থ্যামটা নয়, ভারতনাট্যম।
আশুতোষে যখন পড়তাম, তখন একটা বা দুটো
মেডেলও পেয়েছিলাম নৃত্যগীত ক'রে।
তারপর তোমাদের এই মফঃস্বল শহরে এসে···

ভবভূতি—কী, থামলে যে !

ইন্দ্রাণী—না, আমার কষ্ট হচ্ছে। আবার যন্ত্রণা
পাইথনের মতো পাকে পাকে
জড়িয়ে ধরছে আমাকে।
কোনো মুক্তি নেই, ডক্টর চৌধুরী, ডাক্তার, শ্যামল,
আমার এখন কোনো মুক্তি নেই আর।
কাকে হাহাকার বলে, তা আমি শুনতে পাই, কখনো বাইরে, আর
কখনো ভেতরে।

না, ড্রিংক-ট্রিংক আর নয় আমাদের ব'সবার ঘরে—
মদ খেতে যাবো কেন শুধু শুধু ? আমার তো আপাদমস্তক
নেশায় চুর হ'য়ে আছে।
ছাখো, আমি আর পা ফেলতে পারছি না।
ডানদিকে যাবো ভাবছি, চলে যাচ্ছি তখনি বাঁ-দিকে।
বাঁদিকের শোবার ঘরে যেতে গেলে, শুধু ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে
দাঁড়িয়ে পড়ছি।
আগে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে, মেজে থেকে
মোজা বা রুমাল ওপরে তুলতে পারতাম,
ভবভূতি খ্যাপাতো আমাকে, ব'লতো prehensile toe—
কিন্তু এখন আমার শরীর আর আমার আয়ত্তে নেই।

অমিয়—সামনেই আমি আছি, ইন্দ্রাণী, আমি পেশায় ডাক্তার।
তাছাড়া, চৌধুরী আর তোমার বন্ধু—
তোমার কী হয়েছে আমি জানি, এখুনি ওষুধ দিচ্ছি,
খেয়ে নাও।
তারপর ঝরঝরে শরীর নিয়ে দেখাও না ভারতনাট্যম,
কিংবা থ্যামটা, কিংবা তুমি যাকে আগে নকল ক'রতে
সেই বাচ্চা বাউলটার "ও ভোলা মন" স্টাইলের
ঘুরুং ঘুরুং নাচ।

শ্যামল—বলো তো আমি বৈরাগী সাজবো, তুমি বৈরাগিনী।
ভবকে নাহয় ছেড়ে দাও, ডাক্তারেরও footsteps ভালো নয়,
জানো আমি পেনসিলভানিয়ায় একমাস
ট্যাপ্-ড্যান্স শিখেছিলাম।
ড্যানি কে'র মতো নাচতে পারতাম, মনে হয়।
চন্দ্রদাস না পূর্ণ দাস, ওদের নাচের স্টেপ এমন কি কঠিন ?

ভবভূতি—বেশ তো, ইন্দ্রাণী, তুমি শ্যামলের সঙ্গে
ট্যাপ্-ডান্স বা বাউল-নৃত্য বা অন্য কোনো ঢঙের নাচ
আরম্ভ করো।
শুধু বেশি শব্দ ক'রো না, পাড়া-পড়শী

আমাদের মতো enlightened নয়।
তারা জানলায় ঢিল ছুঁড়তে পারে।

(নেপথ্য থেকে আবার গান ভেসে এলো :

ক্যানেলের জল পেলে যারা
তাদেরই চ্যা-য হ'লো সারা—
মেঘের জল হয়েছে হারা
গেলো ধানের বীজন মারা।)

ইন্দ্রাণী—কে, কে, ধানের বীজ নষ্ট হবার গান গাইছে।
আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ভবভূতি।
এটা তো ফেব্রুয়ারি মাস, ধান কাটা হয়ে গেছে নভেম্বরে,
তাহ'লে এই অলক্ষুণে গান কারা গাইছে?
আমি জানি, বীজ নষ্ট হ'য়ে গেলে, আর ধান গজাতে পারে না।
বীজ নয়, বীজন, ধানের চারার সার সার বীজন ক্ষেত জুড়ে।
সত্যি, বীজ কাকে বলে আগে কখনো কি এভাবে ভেবেছি?
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বীজের বিদ্যুচ্চমক কেঁপে ওঠে,
আমার তো বায়োলজি ছিলো, কেমিষ্ট্রিও কিছুটা পড়েছি,
আমি জানি পুরুষের রক্ত কিভাবে বীজে পালটে যায়—

ভবভূতি—তার জন্যে বায়োলজি, কেমিষ্ট্রি পড়বার দরকার হয়না, ইন্দ্রাণী।
একটা বয়ঃসন্ধির বাচ্চাছেলেও এই সব কথা জানতে পায়।
তোমার কি হয়েছে বলো তো, মাঝে মাঝে চ'মকে চ'মকে উঠে
ট্রাজেডির নায়িকার মতো স্পীচ দিচ্ছো।
একবার আমার কথা কি তুমি ভেবে দেখেছো? আমিও তো পুরুষ,
কল্যাণীকে আমিই জন্ম দিয়েছিলাম, তুমি গর্ভে ধরেছো,
এখন এই মাঝবয়সের শুরুতেই আমার যৌবন
বিদায় নিচ্ছে, ঘোর লাগা সূর্যাস্তের মতো পাহাড় চূড়ায়,
আমি তবুও তো চাইছি সব শান্তভাবে মেনে নিতে,
মেনে নিতে আমার ভাগ্য, মেনে নিতে পরিপার্শ্ব, সব,
আর তুমি চেঁচিয়ে মরছো উন্মাদের মতো।

ইন্দ্রাণী (ঠোঁটে আঙুল দিয়ে)—চুপ। একটু চুপ করো! একটাও কথা ব'লো না তোমরা। চুপ।
কী যেন একটা গজিয়ে উঠছে আমার পেটের ভেতরে,
তার নাড়ির শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি।
ঠিক শব্দ নয়, জানি আমার গর্ভে কারো জন্ম হচ্ছে না,
কিন্তু যা হ'তে পারে, তার সম্ভাবনা যেন
তিরতির ক'রে ক্রমশ ওপর দিকে উঠে আসতে চাইছে।
অস্ফুট একটা শব্দ, বুঝলে, যেন দেয়ালের
ছোটো একটা গর্ত দিয়ে, ফিশ ফিশ ক'রে হাওয়া বইছে।
আমি মাঝেমাঝে শুনতে পাচ্ছি, কখনো পাচ্ছি না,
তবু মনে হয়, আরো একটু ভেতর দিকে কান পাতলে
ঠিক শুনতে পাবো।
চুপ। দোহাই তোমাদের, একটু চুপ করো। চুপ।

অমিয়—চৌধুরী, আমার মনে হচ্ছে, ইন্দ্রাণী কোনো একটা সাইকেসিসে ভুগছে।

(ভবভূতির কাছে গিয়ে, একটু নিচু গলায়)
ওকে কলকাতায় নিয়ে কোনো সাইকেট্রিস্টকে দেখাতে হবে।
যদি বলো, আমি ডক্টর মজুমদারকে লিখে
একটা appointment ক'রে রাখি।
তুমি তো জানোই, ডক্টর ঝুলন মজুমদার খুব বড়ো সাইকেট্রিস্ট।

ভবভূতি—কলকাতায় একজনও সাইকেট্রিস্ট নেই—
ঝুলন মজুমদার-টজুমদারকে আমি চিনি না, চিনতেও চাই না।
অনেকদিন আগে, কলকাতায়, আমার একবার
nervous breakdown হয়েছিলো, আমি এক সাইকেট্রিস্টের কাছে
গিয়ে যা নাকাল হয়েছি,তা তোমাকে আর ব'লতে চাইনা, ডাক্তার।

শ্যামল—ডাক্তার, চৌধুরী যা বলছে, তা হয়তো ঠিক।
এসো, আমরাই অন্যভাবে ইন্দ্রাণীকে এই fixation থেকে
divert করি। তুমি তো জানোই, ও কতো আধুনিক,
আর কতো প্রাণোচ্ছল মেয়ে—
কলুকে হারানোর দুঃখ, আর চৌধুরীর অকাল-বার্ধক্য

ওকে আগুনের হল্‌কার মতো পুড়িয়ে মারছে।
আমাকে একটু সময় দাও, আমি একটা কিছু
ভেবে বার ক'রবো।
ওষুধপত্রে ওর কাজ হবে ব'লে মনে হয় না,
ওর অন্য কিছু চাই।

অমিয়—হয়তো তুমিই ঠিক বলছো, কিন্তু আমি তো ডাক্তার,
সব অসুখেই একটা diagnosis, আর তারপরে
ওষুধের ব্যবস্থা ক'রতে চাই।
আমার দোষ নয়, এঞ্জিনিয়রসাহেব,
এটা হ'লো পেশাগত অভ্যেসের দিক,
কিন্তু আমি তো শুধু ডাক্তার নই, মজুমদার,
আমিও ইন্দ্রাণীর বন্ধু। ওকে আমিই
বাথ, বেটোফেন, রাখমানিনভ শিখিয়েছি।
এই তো মাস ছয়েক আগে, গ্রেগোরিয়ান চাণ্ট নিয়ে
আমাদের মধ্যে তর্ক হলো।
ও জিতলো, না আমি জিতলাম, মনে নেই,
কিন্তু···যাই হোক, খুব ভালো কেটেছিলো
একটা বিকেল, এঞ্জিনিয়র।

(মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ম্লান হ'য়ে এলো। একপাশ থেকে ভবভূতি, অন্যদিক থেকে শ্যামল নিঃশব্দে উইংসের আড়ালে চ'লে গেলো। ফ্ল্যাশ-ব্যাক।)

ইন্দ্রাণী—না, না নাইন্‌থ সীক্ষণী নয়, প্যাস্টোরাল খুব ভালো
লাগে। দাঁড়াও, আমি স্টেরিও তে আরেকবার প্যাস্টোরাল
দিয়ে আসছি, তুমি মন দিয়ে শোনো

(এক মিনিটের জন্যে, ইন্দ্রাণী উইংসের আড়ালে গেলো, আর বেজে উঠলো বেটোফেনের প্যাস্টোরাল।)

জানি, ডাক্তার, তুমি আমার চেয়ে Western Music
ঢের বেশি বোঝো।

অমিয়—চুপ করো তোমার প্রিয় বাজনা মন দিয়ে শুনতে দাও।

(মিনিট তিনেক বেটোফেনের প্যাস্টোরাল বেজে চললো, তারপর)

ইন্দ্রাণী—যেন জল, হাওয়া, গাছ, মাটি, ফল
চারপাশে ছড়ানো রয়েছে। মাঝখান দিয়ে
সরু সরু পা ফেলে পা ফেলে মানুষ চলেছে,
কতোরকমের মায়া আছে পৃথিবীতে, কতোরকমের ভালোবাসা···

অমিয়—আরো একটু কাছে এসো, ইন্দ্রাণী, আরো একটু কাছে এলে
তোমাকে আমার ভালোবাসা আরো একটু স্পষ্টভাবে জানাতে পারবো।

ইন্দ্রাণী (হেসে)—তোমার আর শ্যামলের এই এক অসুখ, ডাক্তার,
একটু সুযোগ পেলেই, আমাকে চুমু খেতে চাও।
ভব কলকাতায় গেছে, শ্যামল এখন ধানবাদে,
আর এই ফাঁকে, গানবাজনা শেখানোর ছল ক'রে
তুমি চাইছো আলটপ্‌কা প্রেম ক'রে নিতে।
একটু control করো নিজেকে, অমিয়,
আরো একটু control, কেমন!

অমিয়—আমি যদি চুমু খাই, তোমার ঠোঁট কি উবে যাবে?
তাছাড়া, চুমু তো আমি আগেও খেয়েছি, নতুন কিছু না,
তাহলে আজকে এতো ছটফট করছো কেন?
বলো, আমাকে উত্তর দাও।

ইন্দ্রাণী—কটা বাজে, সেদিকে খেয়াল আছে!
এখুনি ইস্কুল থেকে কলু আসবে, তাছাড়া
চৌধুরীর দুজন ছাত্রের আসবার কথা আছে।
তার চেয়ে, তোমার প্রিয় নাইন্‌থ সীক্ষনী দিচ্ছি
স্টেরিওতে, মন দিয়ে শোনো

অমিয়—না, না, সত্যিই বাইরে কাদের যেন পায়ের শব্দ
শুনতে পাচ্ছি। আজ উঠছি বরং—
কাল নয়, পরশু আবার আসবো দুপুরবেলায়।
(ডাক্তার উঠে চ'লে গেলো।)

ইন্দ্রাণী—যেন পাহাড়ের সরু রাস্তা দিয়ে তুলোর পেঁজার মতো
গলায়-ঘণ্টা-পরা একপাল ভেড়ার শাবক আস্তে আস্তে চলেছে কোথায়,

আর উপত্যকা থেকে হঠাৎ পাগল হাওয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়লো গাছ-পালায়
প্যাস্টোরাল, প্যাস্টোরাল, চারপাশে ছড়ানো সকাল প'ড়ে আছে।

(একটু থেমে)

যাই, একটু বাইরে যাই। দেখি কেউ অপেক্ষা করছে কিনা দরজার দাঁড়িয়ে।

(আলো আস্তে আস্তে ম্লান হ'য়ে, আবার জ্বলে উঠলো। এক ফাঁকে ভবভূতি আর চৌধুরী এসে, তাদের চেয়ারে ব'সে পড়েছে।)

শ্যামল—আমিও ইন্দ্রাণীর বন্ধু, ডাক্তার।
তোমার মতোই ঘনিষ্ঠ, তোমার মতোই
ভবভূতি ইন্দ্রাণীর শুভাকাঙ্ক্ষী আমি।
চৌধুরী ইন্দ্রাণীকে সাইকেট্রিস্টের কাছে পাঠাতে চায় না,
আর তার কারণও তো জানিয়েছে বিস্তৃতভাবে।
আমার তো মনে হয়, কিছুটা সময় চ'লে গেলে
আস্তে আস্তে ঘা শুকিয়ে আসবে।
আবার নতুনভাবে বেঁচে উঠবে ইন্দ্রাণী চৌধুরী—
আজকে বরং চলো, আমার সঙ্গে উঠে পড়ো
ভবভূতি, ইন্দ্রাণীকে একা থাকতে দাও

অমিয়—ঠিক আছে, চলো

ভবভূতি—একটা বার্মিজ সিগার নিয়ে যাবে নাকি, শ্যামল।

ডাক্তারের তো এ সব বালাই নেই।

শ্যামল— না, থাক, এখন আর ইচ্ছে করছে না

ইন্দ্রাণী (বিড় বিড় ক'রে)—
জটি বুড়ি, জটি বুড়ি, জটি বুড়ি
আমি নই তোর মতো থুথরি,
ভানা আছে, করি তাই ঘোরাঘুরি,
জটি বুড়ি, জটি বুড়ি, জটি বুড়ি···

(আস্তে আস্তে পর্দা নেমে এলো।)

তৃতীয় দৃশ্য

মার্চ-এপ্রিল

ইন্দ্রাণী—আমি একটা উপায় ভেবেছি বুঝলে, ভবভূতি।
তুমি তো নিজেকে আলোকপ্রাপ্ত ব'লে মনে করো, আর সত্যিই তো
আলোকপ্রাপ্ত তুমি।
আর আমি? আমি হয়তো সব কিছু তেমন বুঝি না। মাঝে মাঝে
অন্ধকারে থাকি। জানো, মাঝরাতে পাশের বাড়ির করোগেটের ছাতে
হঠাৎ বৃষ্টি নামলে, যে রকম আঁধার মেশানো শব্দ শোনা যায়, আমি অনেকটা
তেমন ঘোরে থাকি।
তবু আমি ও তো, আমি ও তো enlightened। তাই না, ডক্টর চৌধুরী

ভবভূতি—তুমি enlightened কি enlightened নও, তা নিয়ে
হঠাৎ আবার বকবকানি শুরু করলে কেন?
বলো, কি বল'তে চাও, স্পষ্ট ক'রে বলো?
কী জানতে চাও?

ইন্দ্রাণী—ঠিক আছে, আমি বলছি, স্পষ্ট করেই বলছি,
তুমি মন দিয়ে শোনো।
তোমার যৌবন যে কোনো কারণে হঠাৎ কর্পূরের মতো
উবে গেছে, কিন্তু শ্যামল, বা ডাক্তার,
ওরা তো এখনো নিশ্চয়ই যুবক রয়েছে।

ভবভূতি—হ'তে পারে, তাতেই বা কী, তুমি তো ওদের দুজনের সঙ্গেই
প্রেম-টেম করেছো, আমি টের পাই না ভেবেছো,
আর কী ক'রতে চাও বলো?

ইন্দ্রাণী—না, ঠিক প্রেম নয়। আমার প্রেম তো তোমার সঙ্গেই, ভবভূতি।
আমি চাই একটি সন্তান, হ্যাঁ একটি সন্তান।
শ্যামল বা ডাক্তার যে কেউ আমার দ্বিতীয় সন্তানের
বাবা হোক, দুজনকেই আমার ভালো লাগে।
আমি জানি, তুমি কোনো আপত্তি করবে না।

ভবভূতি— আপত্তি ক'রবো না ? তুমি কি পাগল হয়েছো, ইন্দ্রাণী।
তুমি কি উন্মাদ হ'য়ে গেছো ?
আমার সামনে একটা জারজ বেড়ে উঠবে,
অমিয় কি শ্যামলের ছেলে কিংবা মেয়ে,
'বাবা, বাবা' ব'লে আমাকে ডাকবে, তাকে
স্কুল কলেজে যখন পাঠাবো তখন ডক্টর ভবভূতি চৌধুরী
তার বাবা, এই কথা লিখতে হবে।
হয়তো অমিয় কিংবা শ্যামল জীবনে এ-বিষয়ে মুখ খুললো না,
হয়তো সন্তানটিও প্রথম প্রথম জানলো না, তার বাবা কে—
কিন্তু যদি জানতে পারে, তাহ'লে সে তোমাকে আমাকে দুজনকেই
ঘৃণা করবে,
আর যদি না-ও জানতে পারে, তা'হলে আমি হয়তো ঘেন্না ক'রবো
তাকে।

ইন্দ্রাণী—না, না, সে কোনোদিন জানবে না। তুমিও কখনো তাকে ঘৃণা
করবে না।
তাছাড়া আমি তো তার সত্যিকারের মা থাকবো, তুমি যদি
একটু আধটু অবহেলা করো, তা'হলে আমি আমার সমস্ত স্নেহ
আবার উজাড় ক'রে, সব পুষিয়ে নেবো, ভবভূতি।

ভবভূতি—না, না, জারজ পালন ক'রতে পারবো না, ইন্দ্রাণী।
আমি এরকম দু'একটা case জানি, ভীষণ tension হয়
পরবর্তী জীবনে। কেউ কাউকে সহ্য ক'রতে পারে না,
ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় নিজেদের।
আর আমি যদি ততোদিনে বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে পরিচিত হই,
তাহ'লে জারজটি সব জানতে পেরেও আমাকে শ্রদ্ধা করবে,
আর লোকে যদি এ বিষয়ে কানাঘুষো করে,
তাহ'লে দেশীমদে ডুবে থাকবে সকালবিকেল,
সমাজের পরগাছার মত বেড়ে উঠবে।
কেউ তাকে সম্মান ক'রবে না এই দেশে ?
সেইসব পুরনো দিনের রাজা-রাজড়াদের কথা ছেড়ে দাও,

Dauphin—টফিন হয়তো তাদের কথা ভাবছো তুমি
কিন্তু তাদের দিন কবে শেষ হ'য়ে গেছে, তুমি তা জানো না।
নাকি জানো ?

ইন্দ্রাণী (আচ্ছন্ন ভাবে)—জারজ ? জারজ কাকে বলে ? বাবা মার মধ্যে
একজন ঠিক থাকলেই তো হ'লো, তাই নয় ?
কর্ণ কি সূতপুত্র না সূর্যের পুত্র, তা ভেবে
কি কেউ কিছু ওকে করতে পেরেছে ?
অন্যায়-যুদ্ধে ও মারা গেছে, কিন্তু ওর মতো বীর
কে আছে কোথায় চরাচরে, তুমি বলো ?
আর আমি তো কুন্তীর মতো idiot নই,
যে আমার সম্ভাব্য সন্তানকে, জন্মের পরেই,
জলে ফেলে দেবো ?

(একটু থেমে)

কে কড়া নাড়ছে ? কে ? হাওয়া নয় ? হয়তো মানুষ ?
হয়তো আমাদের দ্বিতীয় সন্তান।
সে হয়তো স্কুল থেকে ফিরে এলো।
এখন বাইরে সব গাছপালা ঝলসিয়ে গেছে।
ও হয়তো ছাতা নিতে ভুলে গেছে,
খুব কষ্ট হয়েছে রাস্তায়।
কে কড়া নাড়ছো, কে ? বলো, কে দাঁড়িয়ে রয়েছো বাহিরে ?

ভবভূতি—তুমি ভুল শুনছো, কেউ কড়া নাড়ছে না, ইন্দ্রাণী।
কলু মারা যাবার কয়েকদিন পরে আমিও মাঝেমাঝে ভুল শুনতাম,
আর ভাবতাম স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।
কিন্তু আমি এখন পড়াশুনো নিয়ে আছি, আর নোট-বই লিখবো না,
দু'একটা সত্যিকারের ভালো অ্যাকাডেমিক বই লিখে যাবো ভাবছি
জীবনে।
তুমিও তো কবিতা লিখতে একসময়, "দেশ"-এও তো দু'একটা
ছাপা হয়েছিলো,
তুমি কবিতা লেখার দিকে আবার মনোযোগ দিচ্ছো না কেন ?

নইলে, ডাক্তারের সঙ্গে ব'সে Western Music বিষয়ে
আরো শিখে নাও। শ্যামলের সঙ্গে আলোচনা করো
তোমাদের ফেবারিট সাবজেক্ট, cultural anthropology।

ইন্দ্রাণী—না, না ওসব বিষয়ে আমি আর interest পাচ্ছিনা, ভবভূতি।
আমার বুকের-ভেতর-থেকে-জেগে-ওঠা একটা চাপা গুমরোনো কান্না
পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে আসছে।
আর শীতকালের সেই ধানের চারার বীজন নষ্ট হবার গান
মাঝেমাঝে আজও শুনতে পাই।
চারপাশে নানারকমের শব্দ হয়, ভবভূতি, নানারকমের শব্দ হয়।
তুমি হয়তো শুনতে পাও না, আমি ঠিক শুনতে পাই।
আর যখনই শুনতে পাই, তখনই কেঁপে কেঁপে উঠি।
আর মানুষের এক জন্মের মধ্যে অনেক অনেকবার
ছোটো ছোটো জন্ম হয়। আমি যখনই প্রবলভাবে কেঁপে উঠি
তখনই আবার নতুনভাবে জন্ম নিই।
আর কতোবার, কতোবার, আমি কেঁপে উঠেছি, তা শুধু আমিই
জানি, আমিই জানি,
আমার একটু একটু ক'রে বাকল পাল্টে যাচ্ছে,
তবু আমি কাউকে জন্ম দিতে পাচ্ছি না।
এই যন্ত্রণা তুমি বুঝতে পারছো না, ভবভূতি।

(বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ, ইন্দ্রাণী এক মিনিটের জন্যে উইংসের আড়ালে গেলো। আর তারপর তিনজন একসঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ ক'রলো: ইন্দ্রাণী, শ্যামল, আর অমিয়।)

অমিয় (ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে, মৃদুস্বরে)—আচ্ছা আমি ভেবে দেখবো, ইন্দ্রাণী, আমি ভেবে দেখবো।

শ্যামল (মৃদুস্বরে)—আমিও ভেবে দেখবো, ইন্দ্রাণী, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।

ভবভূতি—কী, ডাক্তার, শ্যামল, তোমরা কি ফিসফিস ক'রে বলছো ইন্দ্রাণীকে। বলো, আমাকেও বলো, আমি শুনতে চাই।

অমিয়— তোমার বিরুদ্ধে আমরা একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করছি, ভবভূতি।

তুমি সাবধানে থেকো।
ইন্দ্রাণীকে ইলোপ ক'রে নিয়ে যাবো ভাবছি ফ্রান্সে, কিংবা
জার্মানিতে।

ভবভূতি—তাই নাকি! তা তোমরা দুজনে মিলে যদি ইন্দ্রাণীকে ইলোপ করো,
তাহ'লে কিন্তু খুব অসুবিধায় প'ড়বে।
বরং, শ্যামল আর তুমি একটা কয়েন টস্ ক'রে ঠিক ক'রে নাও,
কে ওকে নিয়ে ইলোপ ক'রবে।
তারপর……

ইন্দ্রাণী—হাঁ, তারপর?

শ্যামল—হাঁ, তারপর?

ভবভূতি—তারপর, ধীরেসুস্থে পুলিশ ডাকবো।
সবাইকে জেলে পুরে আমি একটা সিগার ধরাবো।

(ইন্দ্রাণী ছাড়া সবাই হেসে উঠলো: ভবভূতি, অমিয়, শ্যামল।)

ইন্দ্রাণী—চারপাশটা কীরকম ফাঁকা হ'য়ে যাচ্ছে।
যেন কেউ কোনোখানে নেই, কিছু নেই।
কালকে জানালা দিয়ে দেখছিলাম, একটা বেড়াল রাস্তা পার হ'তে
গিয়ে
হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে, যেন চোখ ফিরিয়ে দ্রুত চ'লে গেলো
যেন সবাই বুঝতে পেরেছে আমি করুণার পাত্র, আমি একা,
অথচ আমি কি একা? ভবভূতি বাড়িতেই থাকে
বেশির ভাগ সময়। ডাক্তার, শ্যামল নিয়মিত আসে।
কিন্তু আমি একা, একা, একা,
ভবভূতি যতোই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিক,
শ্যামল কিংবা ডাক্তার…যাক্, এসব এখন
বল'বো না।
শোনো, তোমাদের বলি। তোমরা কারা, তা-ও সঠিক জানিনা
আমাকে তোমরা কী ভাবছো, আমি আঁচ করতে পারছি,
বলো, বলো, বলো। কিন্তু মা হ'তে চাওয়া কি কোনো অপরাধ,

(তারপর একটু চুপ করে, তারপর মৃদু হেসে)

চুপ। কিছু ব'লো না। আমি ঘুমোতে চলাম।

চতুর্থ দৃশ্য

জুলাই

(নেপথ্য থেকে ধান বোনার গান ভেসে আসছে। কিছু পরে নাটকের চারটি চরিত্রই প্রবেশ ক'রবে, তাদের মুখে মুখোস, পায়ে নাচের ভঙ্গি।)

ভাজো গান : নাম্ মাঠে ধান লাগালাম কলা কলা শিস
আমার দাদার বউ হবি তো ধান সিজিয়ে দিস।

ইন্দ্রাণী— ইস্, ইস্, ইস্,
আমায় নিয়ে কেন এতো ভাবিস
কেন ভাবিস।
হবেই হবে ছেলে আমার, হবেই হবে মেয়ে,
তোরা জানিস, আমার প্রথম মেয়ে ছিলো যে অল্পেয়ে।
হবেই হবে ছেলে আমার, হবেই হবে মেয়ে।

ভবভূতি— না, না, না, আর ছেলেমেয়ে না
এনে দেবো, ইন্দ্রাণী, আমি চুনিপান্না,

ভাজো গান : নাম্ মাঠে ধান লাগালাম কলা কলা শিস
আমার দাদার বউ হবি তো ধান সিজিয়ে দিস

ভবভূতি— না, না, না

ভাজো গান : শালুকের ফুল নির্বুদ্ধি রেতে কেন ফোটে।
যার সঙ্গে গুপ্ত পিরীত
ও গো সেই তো মজা লোটে

অমিয়— হ্যাঁ, সেই তো মজা লোটে
প্রেমিকাকে নিয়ে সে কুঞ্জবনে ছোটে

শ্যামল— ভ্রমর এসে গুন্‌গুনিয়ে কোথায় যেন ছোটে
হ্যাঁ, সেই তো মজা লোটে।

ইন্দ্রাণী— মজা লোটার কথা তো নয়
মজা কে আর লোটে,
দেহের ভেতর অন্ধকারে
আলোর ফুল ফোটে

ভবভূতি— ফুটিয়ে ছিলাম সে-ফুল আমি
কখন গেছে ঝ'রে
সেই থেকে বৌ আমার
গেছে কোথায় স'রে

ডাক্তার— আমার কাছে আছে, ওতো আমার কাছে আছে।
এলে ফাগুন, ফুটবে ফুল আগুনবরণ গাছে।
সে তো আমার কাছে আছে।

শ্যামল— আমার কাছেও থাকে সে তো, আমার কাছেও থাকে—
আমি তাকে জড়িয়ে ধরি কখনো এককাঁকে

ইন্দ্রাণী— আমার চাই পুরুষ, চাই পুংকেশরের রেণু।
কুঞ্জবনে হাওয়া শোনায় মাতাল-করা বেণু।
স্বামী আমার স্বামীই আছে, ছাড়বো তাকে কেন ?
কিন্তু আমার সন্তানের পিতা হয় পুরুষ মানুষ যেন

ভবভূতি— এক পা, এক পা, এক পা,
কখনো দুই, কখনো তিন, কখনো চার,
আমার নল, জানি, এখন শুধু কাঁপা,
কিন্তু আমি সইবো না অনাচার।

ভাজো গান : শালুকের ফুল নির্বুদ্ধি রেতে কেন ফোটে
যার সঙ্গে গুপ্ত পিরীত
ওগো সেই তে মজা লোটে

অমিয়— ফোটে ফোটে, ফোটে,
ওগো, পুকুরে ফুল ফোটে,
রক্ত তিলক প'রে আছি
কেন যাবো গোঠে ?

শ্যামল— একপায়ে আমিও আছি খাড়া
সা—রা—রা—রা—রা—রা,
আমাদের দেবে এখন কারা পাহারা।
এক পায়ে আমিও আছি খাড়া।

ইন্দ্রাণী— আমায় তবে হতে হবে স্বয়ংবরা নাকি।
বলে দেনা, কাকে নেবো, অচিন দেশের পাখি।
ভেতর থেকে কী যেন আজ করছে ডাকাডাকি।
আমায় হ'তে হবে আমার স্বয়ম্বরা নাকি।

ভবভূতি— ফাঁকি, ফাঁকি, ফাঁকি।
বন্ধ ক'রে দেবো আমি
সমস্ত চালাকি

(মঞ্চের আলো ম্লান হ'য়ে এলো, আর নেপথ্য থেকে ভাজো গান :
নামু মাঠে ধান লাগালাম কলা কলা শিস
আমার দাদার বউ হবি তো ধান সিজিয়ে দিস।)

পঞ্চম দৃশ্য

জুলাই

ভবভূতি— ইচ্ছে হ'লে ইন্দ্রাণী, তুমি আমার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনতে পারো
আমি হয়তো তোমাকে divorce-এর সম্মতি দেবো,
কিন্তু যতোদিন তুমি আমার পত্নী আছো,
ততোদিন ডাক্তার কিংবা শ্যামল কিংবা অন্য কেউ
তোমার সন্তানের পিতা হ'তে পারবে না।

ইন্দ্রাণী (আচ্ছন্নভবে)—আমিও adoption-এ বিশ্বাস করি না, তুমিও ক'রো না
নইলে হয়তো এসব সমস্যা আদৌ উঠতো না জীবনে!
কিন্তু আমি চাই আমার শরীরের রক্তে তিলে তিলে বড়ো হ'য়ে
আবার একটি শিশু জন্ম নেবে।
মন্দিরের গর্ভগৃহ সরু, কিন্তু মন্দির বিশাল।

ভবভূতি— তাহ'লে কী কর'বে, ভেবে ছাখো

ইন্দ্রাণী— আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভবভূতি।
divorce-এর কথা আমি ভাবতেও পারি না একবারে।
তাছাড়া, তুমি কল্যাণীর বাবা, তার স্মৃতি এখনো মলিন হয়নি।
আমরা প্রেম ক'রে বিয়ে করেছিলাম।

আমি বুদ্ধিমতী ছিলাম, তাই আমাকে
গ'ড়ে পিঠে মানুষ করতে তোমার বেশি সময় লাগেনি
আমি কি পাগল, যে সব ভুলে যাবো?

ভবভূতি— তবে?

ইন্দ্রাণী— তবে কিছু নয়? মাঝে মাঝে সব শুধু শূন্য মনে হয়।
বীরভূমের লাল মাটি, গাঁ গাঁ মাঠ, শস্যহীন জমি,
গাছে পাখি নেই, ফুল কখনো ফোটে, কখনো ফোটে না
আর আমি এই রিক্ততার মাঝখানে মূর্তিমতী রিক্ততা হ'য়ে
ব'সে আছি

ভবভূতি— আমিও তো রিক্ত, ইন্দ্রাণী। তোমার চেয়েও রিক্ত এক হিসেবে।
তুমি শূন্যের ছবি দেখো, আর আমি দেখি
জলাভূমি থেকে ভৌতিক আলেয়ার মতো কে যেন ডাকছে,
অদ্ভুত হলুদ রং, কিছুটা পাঙাশ আর কিছুটা খয়েরি
আমাকে কি মৃত্যু তবে হাতছানি দিচ্ছে?
আমি স্পষ্ট জানি না, তবু আলো যেরকম অন্ধকারে মেশে,
কিংবা অন্ধকার মিশে যায় আলোর ভেতরে,
সেরকম ঘোরের ভেতরে আমি আছি।
তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী (ভবভূতিকে জড়িয়ে ধ'রে)—না, না, ছেড়ে যাবো কেন?
তুমি তো আমার মেরুদণ্ড, ভবভূতি।
তোমাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে গেলে, আমিও সম্পূর্ণভাবে শেষ হ'য়ে যাবো।
তার চেয়ে, এসো আমরা অন্ধকারের দিকে একসঙ্গে জোর ক'রে তাকাই
যদি আলো ফুটে ওঠে।

ভবভূতি— আলো হয়তো ফুটবে না। আলেয়ার মতো কিছু অস্থির কুহক
হয়তো চকিতে দেখা দিয়ে, আবার চকিতে মেলাবে।
তবু, যতো দিন পারি, এসো আমরা একসঙ্গে বেঁচে থাকি।

তিলে তিলে মৃত্যুর কথা অনেকে শুনেছে
তিলে তিলে বেঁচে থাকা কাকে বলে, কেউ কি জেনেছে ?
এসো, আমরা তিলে তিলে বেঁচে থাকি

ইন্দ্রাণী— শূন্যের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো না, ভবভূতি।
তুমি যে আলেয়া দেখেছো, তাও শূন্যেরই আরেকরকম
ভোজবাজি।
আমি, তুমি, আমাদের ঘরবাড়ি—
সব কিছু একদিন শূন্য ব'লে মনে হবে।
তবু আমরা বেঁচে থাকবো, ভব,
হয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে আবার আমোদ-আহ্লাদ করবো।
তবে এক নাছোড় শকুন ওঁত পেতে থাকবে আকাশে,
সুযোগ পেলেই, নিচে নেমে আসবে ভাগাড়ে।

ভবভূতি— শুনছো, বৃষ্টি পড়ছে, জানলাটা বন্ধ আছে তো ?
সব জানলা আপাতত বন্ধ ক'রে দাও।
তারপর তুমি আমি একসঙ্গে ব'সে থাকি

ইন্দ্রাণী— চুপ। আরো একটু আস্তে। চুপ করো।
আমাকে আবার সব বুঝে নিতে দাও, ভবভূতি।
আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।
কিন্তু এখন ঝিরঝির বৃষ্টির মতন এক হালকা ব্যথায়
সমস্ত পৃথিবী যেন একটু একটু ক'রে কেঁপে উঠছে।
(তারপর একটু থেমে, জোর গলায়)
আপনারা কে, আমি স্পষ্ট জানিনা।
তবে শুনে রাখুন, আমি আর আমার স্বামী
এখন শূন্য উদ্‌যাপনের জন্যে ভেতরের ঘরে যাচ্ছি॥
বিদায়, বিদায়॥

রচনাকাল : ১. ৬. ৮৪

মরণ রে !

মৃত্যুকে স্বচক্ষে দেখতে পাব
অসম্ভব এ আশাটা
কবেই-না অস্তে চলে গেছে।
মৃত্যুকে সবাই কিছু প্রত্যক্ষ করে না।
সকলেরই তবু কিন্তু মৃত্যু হয়ে যায়।
যেমন প্রস্রাব করে উল্লিঙ্ক বয়স।
এলানো বয়সকালে অনেকেরই
আপনা-আপনি কিন্তু
বিছানা-টিছানা ভিজে যায়।

দুজাতের দুটি ধাতু
হওয়া আর করা
এই-যা তফাৎ।
হাঙরের হাঁ করা দাঁত (যদিও
হাঙর আমি অদ্যাপি দেখিনি)
দুপাটি আলাদা যদি, তবে
আলগা হাসি ;
মিললে আর বাঁচা নেই।
মরা।

সন্তোষ কুমার ঘোষ

অলিন্দ শরৎ সংকলন, ১৩৯১

প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষ.

গলা শুনতে পাই। সাধারণত বিকেলবেলায়, কখনো সন্ধেয়, আর কখনো বা নিশুত রাত্রে। "প্রণবেন্দু, ভালো আছো ?" ঠিক সন্তোষদার গলা। আমি মাঝেমাঝে চমকে চমকে তাকাই। এই তো কিছুদিন আগে ক্যাওড়াতলায় তাঁকে শেষ দেখে এলাম। তবে ? ব্রীচ ক্যাণ্ডি হাসপাতালের কিছু দূরে আছড়ে পড়ছে ফেনোদ্বেল সমুদ্র, আর ক্যান্সারক্লিষ্ট সন্তোষকুমার ঘোষ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁরই জীবনের মতো উচ্চাবচ, বেলাভূমিতে-

আছড়ে-পড়া সফেন সমুদ্রের দিকে। আর চিঠি লিখছেন, ছোটো ছোটো চিঠি, তাঁর প্রিয়জনদের কাছে। তারপর বেলভিউ নার্সিং হোম। "কেমন আছেন সন্তোষদা? বৌদি কেমন আছেন?" "এক মিনিট দাঁড়াও, আমি ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নিই—আবিরলাল মুখার্জী গলায় একটা যন্ত্র লাগিয়ে দিয়েছেন। হয়তো ফিশফাশ ক'রে কথা বল'তে পারবো। মেরিঅ্যান কেমন আছে? একদিন এসেছিলো।" তারপরে? নিস্তব্ধতা, কোলাহল লোকমুখের জবান, ডাক্তারের গল্প, চিকিৎসার। "সন্তোষদা যখন এসেই পড়েছেন রোববার সকালে, তখন খেয়েই যান।" বেশ, একদিন নয়, একাধিক দিন। তারপর বসার ঘরের কাউচে বই পড়তে পড়তে ঘুম, চারটেয় চা, তারপর আবার রাস্তায়। "প্রণবেন্দু তোমার কবিতা আমার ভালো লাগে।" "ধন্যবাদ।" টেলিফোনে অন্তত কুড়িবার জানিয়েছেন এই কথা, মুখে আরো বেশি। "আপনি কি পথভ্রষ্ট কবি, সন্তোষ দা"—কাকে যেন জিগ্যেস করলাম কথাটা। নিজেকেই। আপনার কিছু কিছু গল্পের কোনো তুলনা আছে, কোন কোনো উপন্যাসের? আপাতত বিদায়, সন্তোষদা কেমন আছেন আপনি?

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

শান্ত রায়-এর

উজ্জ্বল কবিতা গ্রন্থ

সন্ধের লোকাল ট্রেন

বিনিময় : দশ টাকা

কৃশানু প্রকাশন

কলকাতা-৭০০০৬৪

পরিবেশক : দে বুক স্টোর

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

With Best Compliments from :

CHLORIDE INDIA LIMITED

Makers of

EXIDE,

DAGENITE

and

INDEX

Batteries